নববর্ষ,

প্রথম সংখ্যা।

বৈশাখ,

সন ১৩২৬ সাল।

অঞ্জলি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক

শ্রীকৃষ্ণ বিহারী দত্ত।

কার্য্যালয় :—

৮৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] প্রাব ,

[illegible] আর্য্য

প্রতি সংখ্যা

মূল্য /১০ পয়সা।

সূচী।

নিয়মাবলি।

১। অঞ্জলির বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১২ সংখ্যা ডাকমাশুল সহ ১৲ একটাকা মাত্র। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা /১০ মাত্র ডাকযোগে বা লোক মারফতে "অঞ্জলি"র বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। "অঞ্জলি" প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্ত হইলে উক্ত তারিখেই "অঞ্জলি"র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র দিলে তাহার তদন্ত ও প্রতিকার করা হয়। অথবা দুই তিন মাসের পত্রিকা একত্রে পাই নাই বলিলে সেজন্য আমরা দায়ী নই।

৩। গ্রাহকগণ কোন পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৪। কেহ স্থান পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে এবং বিজ্ঞাপন দাতাগণ বিজ্ঞাপন বদল করিতে চাহিলে পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে তাহা আমাদিগকে জানাইবেন। নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৫। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ চাহিলে সঙ্গে সঙ্গে ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে হয়।

৬। 'বেয়ারিং' বা 'ইনসাফিসিয়েণ্ট' পত্রাদি গৃহীত হয় না। ষ্ট্যাম্প বা রিপ্লাই কার্ড ব্যতিত পত্রোত্তর দেওয়া যায় না। লোক পাঠাইলে লোক মারফতেও উত্তর দেওয়া যায়। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং চিঠিপত্র, টাকা কড়ি বিনিময়ে সাময়িক পত্র ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া উপযুক্ত রসিদ লইতে হয়।

বিজ্ঞাপনের হার।

মলাটের ৪র্থ পৃষ্ঠা ৫৲ টাকা, মলাটের ৩য় পৃষ্ঠা ৪৲ টাকা, মলাটের ২য় পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা সাধারণ প্রতি পৃষ্ঠা ২॥০ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১॥০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৲ টাকা। অন্য কিছু জানিতে ইচ্ছা থাকিলে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত অবগত হউন।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ দে।
ম্যানেজার—
শ্রীবিষ্ণু পদ দাস।
প্রকাশক—

বিষ্ণু প্রেস—১৯ নং ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান কলিকাতা।

অঞ্জলি—



ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমোনমঃ।
বেদবেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এবচ॥

অঞ্জলি।

১ম বর্ষ } বৈশাখ, ১৩২১ সাল { ১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

ভদ্রকালৈঃ নমোঃ নিত্যং সরস্বত্যৈঃ নমোনমঃ।
বেদবেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এবচ॥

এস মা শতদলবাসিনী বাণীবিদ্যাদায়িনী সরস্বতী "অঞ্জলি"কে আশীর্ব্বাদ ক'রবে এস। "অঞ্জলি" আজ সাধারণের সেবা কামনায় উৎকণ্ঠীত। অযোগ্য আমরা, আমাদের "অঞ্জলি"ও অযোগ্য। সুতরাং "অঞ্জলি" দ্বারা সাধারণের মনোরঞ্জন অসাধ্য। হে অসাধ্যসাধিকা-অঘটন ঘটন পটীয়সী, আশীর্ব্বাদ কর মা, "অঞ্জলি" যেন সাধারণের উৎসাহোপদেশ ও কৃপা লাভে বঞ্চিত না হয়।

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই,
তোমার কাছে মা এসেছি ছুটী
বাসনা—তাহাই গুছায়ে যতনে,
সাজাব তোমার চরণ দুটী ;
চাহি নাক কিছু, তুমি মা আমার,
এই জানি, কিছু নাহি জানি আর ;
তুমি গো জননী হৃদয় আমার,
তুমি গো জননী আমার প্রাণ।
জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে, চাহিনা অর্থ, চাহিনা মান ;
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটী অমল কমল চরণে স্থান॥

নিবেদন।

সংসার কাননে বসি,
ভাবিতেছি দিবানিশি,
কোথা তুমি, কোথা আমি, অনাথ শরণ!
আমার রোদন ধ্বনি,
আমার কাতর বাণী,
পশে কি তোমার কাছে হে দীন তারণ,
আরাধনা স্তব স্তুতি,
জানিনা হে বিশ্বপতি,
দীন হীন অন্ধ আমি অবোধ অজ্ঞান।
অপরাধ মনে হ'লে,
হৃদয়ে অনল জ্বলে,
ভাবি তব বিশ্ব রাজ্যে নাহি মম স্থান॥
মায়ার কুহকে আমি,
ভুলিয়ে তোমায় স্বামী,
রবির কিরণে হেরি জাগ্রত স্বপন।
কামিনী কাঞ্চন লয়ে,
সর্ব্ব ধর্ম্ম তেয়াগিয়ে,
অনিত্য সংসারে নিত্য রয়েছি মগন॥
এ হেন পাতকী জনে,
তারিবে কি নিজগুণে,
হেরিব কি শ্রীচরণ মঙ্গল নিদান,
কৃতাঞ্জলি পুটে হরি,
কাতরে মিনতি করি,
ভ্রান্তি পথ হ'তে মোরে কর পরিত্রাণ॥

ভোলানাথ ভুল পথে,
দিওনা আমায় যেতে,
সুমতি করিও দান ভ্রান্তি বিনোদন!
সম্পদে বিপদে বিভু,
যেন নাহি ভুলি কভু,
শান্তিময় নাম তব বিপদভঞ্জন!
হৃদয় কুটীরে নাথ,
কর কৃপা দৃষ্টিপাত,
ঘুচে যাক হৃদি তমঃ তমো বিনাশন!
বিবেক বৈরাগ্য যোগে,
প্রেম ভক্তি অনুরাগে,
সতত রহিবে চিত ধ্যানে নিমগন॥
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব যোগে,
নিত্য নব কর্ম্ম ভোগে,
ঘাত প্রতিঘাতে যবে আলোড়িত মন
রসনা নিয়ত যেন,
করে সদা উচ্চারণ,
"তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক শ্রীমধুসূদন!"
করি নাথ প্রণিপাত,
পূর্ণ ক'র মনোসাধ
অন্তিম শয্যায় যবে করিব শয়ন।
গুরুদেব সহ তুমি
দিয়ে দেখা অন্তর্ব্যামি!
এ ভব বন্ধন মোর করিও মোচন॥

শ্রীঅমূল্যচরণ নাগ চৌধুরী।

বাতি ঘর।

রাজার স্বেচ্ছাচার তথায় প্রবেশ করিবার জন্য লালায়িত নহে, সমাজের কোলাহল তথায় স্থান পায় না, তথায় আর কিছু নাই কেবল পশ্চাতে ধূ ধূ করিতেছে মাঠ আর সম্মুখে রাশি রাশি বারি, সেই জন্য ফ্রানসিস্ বৃদ্ধ বয়সে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ স্থানে জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিবার নিমিত্ত এই সমুদ্রের তটে আসিয়া বাতিঘরে আলো দেওয়ার কার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক অজ্ঞাতবাস করিতেছেন। সঙ্গে তাঁহার একমাত্র কন্যা, অন্ধের যষ্টি মিস্ এমিলী।

ফ্রানসিসের বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। তাহার জীবন-সূর্য্য পশ্চিমাকাশে অস্তমিত প্রায়, বৃদ্ধের চর্ম্ম লোল ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাহার জীবনের সমস্ত সাধ এখন ফুরায় নাই, তাহার এখন কিছুকাল বাঁচিবার ইচ্ছা আছে। বৃদ্ধ সমস্ত দিন তাহার ক্ষুদ্র কুটিরখানিতে বসিয়া সমুদ্রের বীচিমালা নিরীক্ষণ করিত, কখন সে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া একমনে পড়িত, পড়িবার সময়ে কখন কখন তাহার বক্ষস্থল গর্ব্বে স্ফীত হইত, শান্তজ্যোতিঃপূর্ণ নয়নদ্বয় দীপ্তিতে পূর্ণ হইত, আবার কখন বা প্রকৃতির নিস্তব্ধতায় গা ঢালিয়া দিয়া স্থির নয়নে আকাশের পানে চাহিয়া রহিত; তাহার পর একটী দীর্ঘনিশ্বাসে সমস্ত দুঃখ বাতাসের সহিত মিশিয়া যাইত, বৃদ্ধের প্রাণনা তখন লাঘব হইত।

ফ্রান্সিসের অবস্থা চিরদিন এ প্রকার ছিল না। একদিন সে সহস্রাধিক সৈন্যের সেনানী ছিল, তাহার একটি ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র তরবারি কোষ হইতে বহির্গত হইয়া শত্রুর নয়ন ঝলসাইয়া দিত, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যে সে তাহার রাজার সহিত একমত

হইতে পারে নাই বলিয়া অদ্য সে নির্ব্বাসিত—কিন্তু এ নির্ব্বাসনেও সে রাজ্যসুখ অনুভব করিতেছে।

মিস্ এমিলীর বয়স সতের বৎসর। তাহার শরীরে যৌবন চিহ্ন দেখা দিয়াছে, সে প্রস্ফুটীত গোলাপের ন্যায় এই নির্জ্জনে ফুটিয়া রহিল। এমিলী এখন দরিদ্রের কন্যা। কেবল এক বৃদ্ধ পিতা ব্যতিত এমিনীর আপনার জন আর কেহ ছিল না। তাহাদের উপস্থিত আর কিছুই ছিল না, কেবল একখানি ক্ষুদ্র কুটীর আর তাহার অসাধারণ রূপরাশি। .

বালিকা বন্য হরিণীর ন্যায় এই নির্জ্জনে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত। সন্ধ্যার প্রারম্ভে পর্ব্বতোপরি উঠিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া থাকিত—আর তাহার বাল্য প্রণয়ের স্মৃতিটুকু লইয়া তাহার লক্ষ্যশূন্য জীবনেকে ক্ষণেকের জন্য সুখী করিত। আহা, .স স্মৃতি কত মধুর!

এমিলী ভাবিত কার্লোর অপরাধ কি? ভগবান! রাজ্যে বিশ্বাসঘাতকতা অরাজকতা হইল বলিয়া, কি আমার অভাগিনী করিয়া, সেই মধুর সুখ সেই সরল কটাক্ষ কালপ্রবাহে ভাসাইয়া দিলে! আবার ভাবিত, না, প্রেম অপেক্ষা কর্ত্তব্য বড়!

এমিলী যখন নৌকা লইয়া সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গে তরঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইত, তাহার তাম্রবর্ণের কেশগুচ্ছ বাতাসে উড়িয়া পালের ন্যায় শোভা পাইত, বৃদ্ধ ফ্রান্সিস্ তখন সর্ব্বদুঃখ ভুলিয়া তটদেশ হইতে ভাবিত—'এ এমিলী না জলদেবী!' বৃদ্ধের চক্ষুদ্বয় সহসা জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত।

সন্ধ্যার প্রারম্ভে বৃদ্ধ ফ্রান্সিস্ বাতিটি লইয়া বাতিঘরে দিয়া আসিত এবং স্বয়ং, বহুদূরে যাইয়া বাতিটি নিয়মিতরূপে ঘুরিতেছে কিনা, দেখিয়া আসিত। এমিলী সেই সময় পিতার আশায় সাগর-

সৈকতে বসিয়া সেইদিকে চাহিয়া থাকিত। প্রবল শীত, মহা ঝঞ্ঝাবাত, কিছুই বৃদ্ধকে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত করিতে পারিত না!

সুখে দুঃখে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া যাইল।

এক দিন রাত্রিতে বৃদ্ধ তাহার কন্যার মনোগতভাব জানিবার জন্য বলিল, "চল আমরা আবার দেশে ফিরে যাই।" এমিলীর নয়নদ্বয় কি জানি কেন সহসা চঞ্চল হইল, তাহার হৃদয়ভ্যন্তরে তড়িৎ খেলিল, কিন্তু সে প্রকাশ্যে বলিল,—"না বাবা, যাহাদের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলে তাহারা যখন তোমায় ত্যাগ করিয়াছে, যাহারা তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল তাহারাই যখন তোমার শত্রু হইয়াছে তখন সেই শঠতাপূর্ণময় সংসারে আর ফিরিয়া কাজ নাই।" এমিলী কাঁদিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ তাহার কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "এমিলী তোর দুঃখের কারণ আমি সবই বুঝি। কিন্তু অপরদিকে একটা মহা কর্ত্তব্য আমায় আহ্বান করিতেছে। স্বদেশের যে শত্রু তাহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিতে পারি না; তবু ইচ্ছা হয় একবার স্বদেশে ফিরে যাই।"

"বাবা স্বদেশ তোমায় চায় না।"

"কন্যা, কিন্তু তবু সে স্বদেশ!"

বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইল, এমিলীও কাঁদিয়া ফেলিল।

কয়েকমাস গত হইল। একদিন প্রাতে উঠিয়া এমিলী দেখিল যে তাহার পিতা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত। সমস্ত শরীর দিয়া অগ্নিপ্রবাহ ছুটিতেছে, উত্থান শক্তি রহিত। কিন্তু এই অবস্থায়ও কেবল তিনি বলিতেছেন, "হায় আজ কি করিয়া আলো দিব।" এমিলী তাহার পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না আমি আলো দিব।"

"না মা, তুই পার্‌বিনি, সে বড় শক্ত কাজ। কত শত লোকের প্রাণ উহার উপর নির্ভর করিতেছে।"

"বাবা! তুমিই না শিখাইয়াছ যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিবার নিমিত্ত হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়।"

বৃদ্ধ এইবার নিশ্চিন্ত হইল।

অস্তাগমন্মুখী সূর্য্যের ক্ষীণ দীপালোক সমুদ্র বক্ষে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। দিনমণির বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ শশধর আকাশে উদয় হইলেন, কিন্তু সে ক্ষণিকের তরে। অল্প-ক্ষণ পরে একখানি কালমেঘ আসিয়া সমস্ত জ্যোৎস্নাকে নিজের বক্ষের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে প্রয়াস পাইল।

মিস্‌ এমিলী ধীরে ধীরে স্পন্দিত হৃদয়ে একখানি ছোট নৌকা লইয়া আলোক মঞ্চের দিকে যাইতে লাগিল। বাতাস উঠিল। আলোকমঞ্চের উপর উঠিয়া এমিলী দেখিল যে আজ আর কল্‌ ঘুরিতেছে না। সে মহা বিপদে পড়িল, চক্ষে অন্ধকার দেখিল। বাহিরেও চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া প্রবল বেগে ঝড় উঠিল। অচিরাৎ তাহার ক্ষুদ্র তরণীখানি সমুদ্র তরঙ্গে আলোড়িত হইতে হইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। এমিলীর সে দিকে দৃষ্টি নাই, সে একমনে স্বহস্তে আলোর কল ঘুরাইতে লাগিল।

আলো ঘুরিল কিন্তু সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইল। শৈল-শৃঙ্গের বক্ষে স্ফীত তরঙ্গ প্রহত হইতেছে। সে একবার উপর হইতে নিম্নে চাহিয়া দেখে যে সমুদ্রের বিরাট ঢেউগুলি ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া তাহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত উপর দিকে উঠিয়া আলোকমঞ্চের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে। (তাহার আলুলায়িত কেশ পবন চালিত হইতে লাগিল।) বালিকার হৃদয়ে স্পন্দন থামিয়া আসিতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিলে এইরূপই হয়। বোধ

হইতে লাগিল যে পৃথিবীর ধ্বংসের অব্যবহিত পূর্ব্বের মহাপ্রলয় আজ উপস্থিত। এমিলী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? একটা প্রবল ঝড়ের বেগ আসিয়া বালিকাকে ক্ষুব্ধ সমুদ্র বক্ষে ফেলিয়া দিয়া তাহার মনবাসনা পূর্ণ করিল! উপর হইতে পড়িবার সময় এমিলী চীৎকার করিয়া উঠিল "বাবা"। বৃষ্টি বালিকার ঐ কণ্ঠস্বর লইয়া সমুদ্রে মিলিত হইল, বাতাস ঐ শব্দ বিস্তারার্থে চতুর্দ্দিকে দৌড়াইল।

ঠিক সেই সময় সেই স্থান দিয়া একখানি জাহাজ যাইতেছিল। জাহাজের কাপ্তেন দেখিলেন বাতিঘর হইতে একটি আলো পড়িয়া তরঙ্গে মিশিয়া যাইল; উপর দিকে চাহিয়া দেখেন বাতি-ঘরে আলো নাই। কাপ্তেন সাহেব আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া দেখিলেন যে একটী শ্বেত বস্তু ভাসিয়া যাইতেছে। তাঁহার আদেশানুসারে দুটি মাঝি তৎক্ষণাৎ উহাকে ধরিয়া তুলিল। উজ্জ্বল দীপালোকে সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে সপ্তদশ বর্ষীয়া একটি বালিকা, হাতে বাতি-ঘরের আলো।

বালিকার তখনও ধীরে ধীরে নিশ্বাস পড়িতেছিল। সকলেই তাহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটি যুবক একটু দূরে দাঁড়াইয়া প্রীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে ঐ বালিকার অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল, অপূর্ব্ব রূপের জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এ সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। অল্পক্ষণ পরে যুবকের চক্ষে অশ্রুধারা বহিল। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ডাকিল "এমিলী!" সুপ্তা এমিলী এবার ঈষৎ চাহিল। সকলে দেখিলেন বালিকা এ যুবকের পরিচিতা।

এ যুবক আর কেহ নয়, এমিলীর বাল্যের সহচর, লক্ষ্যশূন্য

জীবনের ধ্রুবতারা, জীবন মরুভূমির একমাত্র "ওয়েসিস্", 'কার্লা।'

কার্লা জাহাজের কাপ্তেনকে বলিলেন, "এ বালিকার পিতা বোধ হয় এখানে কার্য্য করেন, আপনি দয়া করিয়া একখানি নৌকা দিয়া আমাদের উভয়কে কিনারায় রাখিয়া আসিলে, বালিকার পিতার অনুসন্ধান করিয়া ইহার প্রাণ বাঁচাইতে পারি। কাপ্তেন তাহাই করিলেন।

রজনী আবার জ্যোৎস্নাময়ী হইল। সমুদ্র এখন স্থির নিশ্চল।

কার্লা এমিলীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া তাহার জ্ঞানসঞ্চার করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই এমিলীর জ্ঞান হইল। এমিলী চাহিল, চাহিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিল, "বাবা, এই দেখ কেমন আলো ঘুরিতেছে" এমিলী পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল কিন্তু অচিরাৎ আবার সংজ্ঞা পাইল। কার্লা ডাকিল, "এমিলী", এমিলী এবার তাহার প্রাণাপেক্ষা যে প্রিয় তাহাকে চিনিল, কিন্তু চিনিয়াও নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। ভাবিল, এ স্বপ্ন না সত্য, আমি জাগ্রত না নিদ্রিত। এবার সে উঠিয়া বসিল। তাহার আর্দ্র মুখমণ্ডল শিশির নিষিক্ত পদ্ম পত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মুক্ত চন্দ্রালোকে কার্লা দেখিল যে এমিলী ঠিক পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে।

কার্লা এমিলীকে পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত ঘটনা সমস্ত বলিল। এমিলী বলিল "কার্লা চল গৃহে যাই" পিতা তথায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।"

কার্লা দাঁড়াইল। এমিলী দাঁড়াইবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু তাহার মনোরথ বিফল হইল; তাহার আর দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই। এমিলীর অবস্থা দেখিয়া কার্লা বড় ভীত হইল। এমিলী অবশেষে

তাহার অবসন্ন দেহ মাধবীলতার ন্যায় কার্লার উপর ন্যস্ত করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে যাইতে লাগিল।

অল্পদুর গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে বালিকার চক্ষের দীপ্তি লুপ্ত প্রায় হইল, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে দেখিল যে তাহার বৃদ্ধ পিতা সমুদ্র সৈকতে শায়িত। এমিলী 'বাবা বাবা' বলিয়া চীৎকার করিয়া ব্যাতাহত কদলীবৃক্ষবৎ ফ্রান্সিসের উপর পড়িল। বৃদ্ধের জীবন-সূর্য্য তখন অস্তমিত হয় নাই. কিন্তু আর বিলম্বও নাই।

কার্লা মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল। বালিকা আবার ডাকিল, "বাবা, বাবা" বৃদ্ধ একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "কৈ কন্যা আলো কৈ ?" ইহার পরই বৃদ্ধের জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হইল, তাহার প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জরখানি রাখিয়া চলিয়া গেল !

কার্লা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল, কেবল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "ফ্রান্সিস্ তোমার দুর্দ্দশার জন্য দায়ী আমার পিতা ; কিন্তু এই সংসারে তুমিই জয়ী, তোমার স্থান এখান নহে, তোমার স্থান স্বর্গে, তুমি সত্য নহ তুমি একটা স্বপ্ন !"

এমিলী তাহার মৃত পিতার বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া জড়িত-কণ্ঠে অশ্রুনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, "কার্লা, ভাই, ক্ষমা করিও। ইহ-জগতে আর আমাদের মিলন হইবে না কারণ আমাদিগের ভিতর আমার পিতার মৃতদেহ ব্যবধান রহিয়াছে। একদিন পিতা গৌরব করিয়া আমায় বলিয়াছিলেন যে, তোকে চিরদিন অনূঢ়া রাখিব তথাপি স্বদেশদ্রোহীর পুত্রের সহিত তোর বিবাহ দিব না। কার্লা আমার অপরাধ লইও না। যদি পরজন্ম সত্য হয় তাহা হইলে আমরা আবার মিলিত হইব, তথায় হয়ত আমাদিগের শৈশবের আশা সফল হইতে পারে। কার্লা ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, জীবন মরণের সন্ধিস্থলে, পরপারের দুয়ারের নিকট তোমার সহিত সাক্ষাৎ হ'ল। বাবা, এই দেখ কর্ত্তব্যকর্ম্ম পালন করিগে, হাসিতে হাসিতে জীবন দিতে পারি কি না। বাবা দাঁড়াও যাই, ইহ সংসারে তুমি আমায় এক মুহূর্ত্তের জন্য ছাড় নাই আমিও তোমায় এখন ছাড়িব না। কার্ল্, প্রিয়তম বিদায়—"

বীণার তারটি ছিঁড়িয়া গেল। এমিলী তাহার পিতার সহিত মহাপ্রস্থানের পথিক হইল। পূর্ণ শশধরকে সহসা কাল মেঘে গ্রাস করিল। কার্ল্ বজ্রাহত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল সন্মুখে তাহার প্রিয়তমার ও বৃদ্ধ ফ্রান্সিসের মৃতদেহ, উপরে স্থির নীল অনন্ত আকাশ। তাহার বোধ হইতেছিল যে, এখন বৃদ্ধ বলিতেছে "কৈ কন্যা, আলো কৈ?" পূর্ব্বদিকে ঈষৎ কিরণ ফুটিয়া উঠিল। কার্ল্ চীৎকার করিয়া ডাকিল, "এমিলী", সমুদ্র তরঙ্গ দিগন্ত কাঁপাইয়া উত্তর দিল "নাই"।

কার্ল্ বলিয়া উঠিল 'ভগবান এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিবার নিমিত্ত কি আজ আমায় এখানে পাঠাইয়াছিলে! এমিলী, আমার পিতার কার্য্যের জন্য আমি দোষী নই।"

কার্ল্ এমিলীর শবদেহের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল রায়।

সান্ত্বনা।

ক'রোনা গর্জ্জন, মানস তটিনী,
অধীরে মনের দুঃখে।
পাও যদি ব্যথা, বুকের মাঝারে,
লুকায়ে রাখিও বুকে॥

নীচু হ'য়ে হেথা, পেয়েছ' আকার,
ধাতার নিয়মে কত কি হয়।
দুদিনের তরে, এসেছ' মহীতে,
সহিতে হেথায় ক'রোনা ভয়॥

চল কল নদী, অনন্তের কোলে,
দু'পাশের ছায়া বহিয়া।
ভাঙ্গা চোরা গড়া, নহে'ত তোমার,
তুমি এঁকে বুকে যাও চলিয়া॥

উচ্চ গর্ব্ব ভরে, বিজয় নিশান,
তোলে যে তুলুক কি ক্ষতি তোর।
আত্মহারা তুই, অজানা পথিক,
স্বপনে বুঝেছ' ঘুমের ঘোর॥

জেগেছ' কি কভু, জানিতে তোমারে,
ভবিষ্য দুর্গের খুলিতে দ্বার।
ধ'রেছ কি কভু, সে বিরাট রূপ,
এ বিশ্ব বিশাল প্রতিমা যার?

কত শারদ শুভ্র, প্রভাতী গগন,
দেখেছ' পূজিতে চরণে।
কত, মলয় অনিল, নমিতে তোমারে,
হেরেছ' ভ্রমিতে নয়নে॥
গিরি নদ নদী, প্রস্রবণ ধার,
ধরে কি হৃদয়ে তোর।
বাসনার দাস, রে ক্ষুদ্র কণিকা,
তবে কেন এত জোর॥

তুমি আঁধার হইতে, এসেছ' চলিয়া,
আঁধারে চলিয়া যাও।
আলোক আঁধারে, দু'পাশের ছবি,
বুকেতে তুলিয়া নাও॥

শ্রীনিত্যবোধ বিদ্যারত্ন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেবী ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ২৪মে তারিখে কেনসিংটন প্রাসাদে ভূমিষ্ঠা হন। তৎকালের ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র কেণ্টের ডিউক ভিক্টোরিয়ার পিতা এবং স্যাস্কোবর্গের ডিউকের কন্যা 'মহারাণীর' মাতা ছিলেন।—মাতার নামও ভিক্টোরিয়া ছিল।

ভিক্টোরিয়া বাল্যকালে কেন্সিংটনে তাঁহার মাতার নিকট থাকিতেন। এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য ভদ্র মহিলাদিগের ন্যায় সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অদৃষ্ট বর্ত্তমানকালে অদৃষ্টই থাকে। ভবিষ্যতে আবরণ উন্মোচন হইলে সকলই বুঝা যায়। কে জানিত ডিউক দুহিতা পুণ্যশ্লোকা ভিক্টোরিয়া একদিন ইংলণ্ডেশ্বরী ও ভারত সাম্রাজ্ঞী হইবেন। বিধির বিধানে ইংলণ্ডের রাজবংশধরগণ ক্রমে ক্রমে কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিলেন। পরে ভিক্টোরিয়াই ইংলণ্ডের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী স্থির হইল। ১৮৩৭ খৃঃ ১৯ জুন তদানীন্তন রাজা চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুর পর ভিক্টোরিয়া রাণী হইলেন। বাল্যকাল হইতে এতদিন তিনি "অ্যালেকজেণ্ড্রিণা" নামে

পরিচিতা ছিলেন। ভিক্টোরিয়া নামে তাঁহার মাতাই পরিচিতা ছিলেন।

মন্ত্রিসভার প্রথমাধিবেশনে যখন তাঁহাকে সরকারি কাগজপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে বলা হয় তখন তিনি 'এ্যালেকজেণ্ড্রিনা' না লিখিয়া 'ভিক্টোরিয়া' লিখিলেন। অতঃপর তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া নামে সর্ব্বত্র পরিচিতা হইলেন। ১৮৩৮ খৃঃ ২৮ জুনে ওয়েষ্টমিনিষ্টর প্রাসাদে মহাসমারোহের সহিত ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক হয়। ১৮৪০ খৃঃ ১০ ফেব্রুয়ারিতে প্রিন্স এ্যালবার্টের সহিত মহারাণীর বিবাহ হয়। ঐ বৎসর ২১ নভেম্বরে প্রথম রাজকন্যার জন্ম হয়। ১৮৪১ খৃঃ ৯ নভেম্বরে প্রথম রাজপুত্র (স্বর্গীয় সপ্তম এডোয়ার্ড) ভূমিষ্ঠ হন। তাহার পর রাজকুমারী এলিস মেরী, (১৮৪৩ খৃঃ) ডিউক অফ এডিনবরা (১৮৪৪) রাজকুমারী হেলেনা (১৮৪৬) রাজকুমারী লুইসা, (১৮৪৮) ডিউক অফ কনট (১৮৫০), ডিউক অফ এ্যালবানী (১৮৫৩), ও রাজকুমারী বিট্রাইসের (১৮৫৫), জন্ম হয়। ভিক্টোরিয়ার পুত্রগণ সকলেই উদার ও কন্যাগণ সুশীলা। এক কথায়, 'ধনেপুত্রে লক্ষীলাভের' চরম দৃষ্টান্ত মহারাণীতেই দেখা গিয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে (ভারতের ইতিহাসেও নয় কি ?) ভিক্টোরিয়ার ৬৩ বৎসর রাজত্বকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের মধ্যে অনেক মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, ব্যবসাবাণিজ্য, রাজনৈতিক উন্নতি প্রভৃতির সোপান ও উৎকর্ষসাধন মহারাণীর সময় যত হইয়াছে তত আর কাহার সময় হয় নাই। এই সময় সাহিত্যিক—চারল্‌স ডিকেন্স, থ্যাকারি (William Makepeace Thackeray) লর্ড লিটন, চারলর্স লেভার, উইলকি কলিন্স, মিসেস্ হেনরি উড রাসকিন (John Ruskin), কারলাইল (Carlyle) ফ্রিম্যান (Edward

A Freemann), বার্ক (Burke), মেকলে (Thomas Babington Macaulay) প্রভৃতি, **কবি**—সাউদে (Robert Southey) ওয়ার্ডস ওয়ার্থ (Wordsworth), টেনিসন (Tennyson), ব্রাউনিং (Robert Browning), আরনল্ড (Mathew Arnald) ও সার লুইস্ মরিস (Sir Luis Morris) প্রভৃতি, **চিত্রকর**—হলম্যান হাণ্ট (Holman Hunt), সার্ ফ্রান্সিস্ গ্রাণ্ট (Sir Francis Grant), সার এডুইন ল্যাণ্ডসিয়ার (Sir Edwin Landsear), সার গিলবার্ট স্কট (Sir Gilbert Scott), ষ্টাসে মার্কস (Stacey Marks R. A.) প্রভৃতি **বৈজ্ঞানিক**—(লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin), জেমস্ সিম্পসন্ (James Simpson), স্ক্রোটার (Schrotter, inventor of safety Matches), পারকিন (W. H. Parkin), কারবলিক এসিড নির্ম্মাতা ক্যালভার্ট (Fredrick Crace Calvert), ডাক্তার লর্ড লিসটার (Sir Joseph Lister intorducer of Anticeptic Surgery), মাইকেল ফেরাডে (Michael Faraday) সার ডেভিড্ ব্রুষ্টার (Sir David Brewster), হিউ মিলার (Hugh Miller), ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (Clark Maxwell), বেলফোর ষ্টুয়ার্ট (Professor Balfour Stuart), উইলিয়ম টমসন (William Thomson) আরমসট্রঙ্গ (Armstrong), জেমস্ ষ্টারলে (James Starley the chief inventor of Cycle) প্রভৃতি মহাত্মাগণ ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংলণ্ডের ও মানবজাতির প্রভূত উপকার ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন সকলের কীর্ত্তিকলাপের আভাষ স্থানাভাবে সন্নিবেশিত হইল না। এমন শান্তিপ্রিয়া মহারাণীর শান্তিময় রাজ্যের অন্তর্গত নিজ পরিবারের অনেকবার শান্তিভঙ্গ হইয়াছে। ভিক্টোরিয়াকে অনেক শোক পাইতে হইয়াছে ১৮৬১ খৃঃ ১৬ মার্চ্চে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়

এবং ঐ বৎসর ১৪ ডিসেম্বর তাঁহার হৃদয়েশ্বর প্রিন্স আলবার্ট তাঁহার হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে চিরপ্রস্থান করেন। এমন শোক ভিক্টোরিয়া আর কখন পান নাই। আহা! এই ভয়ানক মুহূর্ত্তে এ্যালবার্টের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই স্বামীসোহাগিনী সতীরাণী অধীরা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ওগো আর আমাকে ভিক্টোরিয়া ব'লে কে ডাকবে গো!" শোকের কথা যত আলোচনা না করা যায় ততই ভাল অতএব আমরা এখন 'ইতি' করি। ভিক্টোরিয়ার জীবিতাবস্থায় প্রিন্সেস এ্যালিস, ডিউক অফ ইয়র্ক, ডিউক অফ ক্লেয়ারেন্স, (আমাদিগের রাজা পঞ্চম জর্জের জ্যেষ্ঠভ্রাতা) ও প্রিন্স হেনরী (মহারাণীর কনিষ্ঠ জামতা) পরলোক গমন করেন।

———:•:———

হেঁয়ালি।

১। সূর্য্যবংশে জন্ম তার অজরাজার নাতি—
দশরথের পুত্র নহে সীতাদেবীর পতি।
রাবণের বৈরী নহে লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ—
কহেন কবি কালিদাস হেঁয়ালির শ্রেষ্ঠ।

২। জীয়ন্তে মৌন নাকে মরিলে ভাল ডাকে,
অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে,
অবশ্য তাহারে আনে মঙ্গল বিধানে,
হেঁয়ালী প্রবন্ধ কবিকঙ্কণেতে ভণে।

শ্রীমতী উষা বালা।

(দ্বিতীয় সংখ্যায় উত্তর থাকিবে।)

———

চক্রভেদ।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একটি বিশাল উপবনের পার্শ্বে রাজাপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রাম ও বনের মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ পথ। পথটা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গ্রামের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। একদা নিদাঘ অপরাহ্নকালে এক কিশোরী একাকিনী এই পথে পদচারণা করিতেছিল।

আমরা যাহাকে কিশোরী বলিয়া পরিচিত করিলাম, তাহাকে প্রথম দর্শনে যুবতী বলিয়াই ভ্রম হয়। তাহার দেহ নবযৌবন-পুষ্পিত ও লাবণ্য-পূর্ণ। কিশোরীর বেশভূষাসম্পন্ন কৃষক-বালার ন্যায়। অস্ত-গমনোন্মুখ রবির সুবর্ণ কিরণ তাহার নিটোল সুন্দর মুখখানির উপর পড়িয়া তাহাকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

কিশোরীর প্রতি-পাদনিক্ষেপেই চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতেছে। তাহার চক্ষু দেখিলে বোধ হয়, সে এইমাত্র ক্রন্দন করিতেছিল। তাহার কুসুম-কোমল কপোলে অশ্রুলাঞ্ছনা এখনও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাহার অশ্রুনিষিক্ত নয়নে উদ্বেগ ও বিরক্তির চিহ্ন প্রকটিত। বলা বাহুল্য, কৃষকবালা প্রকৃতির সায়ংকালীন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার নিমিত্ত এমন নির্জ্জন স্থানে একাকিনী আগমন করে নাই। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সে একবার থামিতেছে এবং পথের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

অনতিবিলম্বে ষ্টেশনের দিকে পথিমধ্যে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। মূর্ত্তিটি কিশোরীর সমীপবর্ত্তী হইয়া সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিল, "তাই ত, পার্ব্বতী, তুমি তবে এসেছ।"

"হাঁ, রাও সাহেব।"

রাও সাহেব বয়সে যুবক, গ্রামের জমীদার এবং অদূরবর্ত্তী অট্টালিকার অধিকারী। যুবক পরম রূপবান্, বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত, কিন্তু উদ্ধত।

কিশোরীকে দেখিয়া যুবকের বদনে প্রীতিচিহ্ন ফুটিয়া উঠিল. কিন্তু তাহাকে দেখিয়া পার্ব্বতীর মুখে আনন্দের চিহ্নমাত্রও প্রকাশ পাইল না, তাহার বিষাদ অপগত হইল না, সে আনত-আননে দণ্ডায়মানা রহিল।

যুবক পার্ব্বতীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, "রাও সাহেব!— পার্ব্বতী আজ সম্বোধনের এত আড়ম্বর কেন? আগে আগে ত আমাকে শুধু বলবন্ত বলিয়াই ডাকিতে?"

পার্ব্বতী তখনও বিষণ্নবদনে ভূমি-সংলগ্ন দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছে। সে মৃদুস্বরে বলিল, "তখন আমরা একসঙ্গে খেলা করিতাম।"

"আর এখন আমরা একসঙ্গে খেলা করি না বলিয়া কি আমাদের ভালবাসা ফুরাইল?"

"আপনি জানেন, ও কথা কোন কাজের নয়।"

যুবক তখন তাহার উদ্ধত প্রকৃতি যথাসম্ভব দমন করিয়া, যতদূর সাধ্যমত কোমলস্বরে বলিলেন, "পার্ব্বতী, আমার অপরাধের কি ক্ষমা নাই? তখন আমি মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা কি তুমি আজিও ভুলিতে পার নাই? আমি তখন অপ্রকৃতিস্থ ছিলাম। সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনই আমার আচরণে দূষণীয় কিছু দেখিতে পাইতে না, এই কথাটি বিবেচনা করিয়া দেখিলে না?"

পার্ব্বতী তখন কুপিতা ফণিনীর ন্যায় মস্তকোত্তোলন করিয়া বিস্ফারিতনয়নে যুবকের মুখের দিকে চাহিল। বলিল, "তুমি যখন ছয়মাস পূর্ব্বে পুণা হইতে গৃহে ফিরিয়াছিলে, তখন আমি আমাদের

সেই বাল্যসখিত্ব স্মরণ করিয়া ভগিনী যেমন ভ্রাতাকে সাদরে আহ্বান করে, তেমনি করিয়া তোমাকে আহ্বান করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি পুণায় অবস্থানকালে নারীর প্রতি সম্মান প্রকাশ করিতে শেখ নাই। সেইজন্য সেদিন তুমি আমাকে অপমানিত করিয়াছিলে।"

"আমি অন্যায় করিয়াছি, বলিয়াছি ত মদ্যপান না করিলে আমি তোমার প্রতি কখনই সেরূপ আচরণ করিতাম না।"

"তুমি মদ্যপানে তেমন বিহ্বল হও নাই। বালাজী যখন আমাকে তোমার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তখন তুমি তাহাকে ভয় দেখাইতে ক্রটি কর নাই।"

"আহা! বেচারী বালাজী এখন জেলের ভিতর কত কষ্টই না পাইতেছে।"

বলবন্ত রাও সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে কথাগুলি বলিলেন বটে, কিন্তু কেহ যদি তৎকালে তাঁহার মুখের দিকে তীষণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, প্রতিহিংসার উত্তেজনায় বলবন্তের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

"হাঁ, সে এখন জেলে আছে; আর তুমি আমাকে লিখিয়াছিলে যে, তুমি তাহাকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সাহায্য করিবে, আমি এখন সেই ভরসায় তোমার নিকট আসিয়াছি।"

রাও সাহেব প্রচ্ছন্ন শ্লেষপূর্ণস্বরে বলিলেন, "এমন সময় নির্জ্জন স্থানে একাকিনী আসিতে তোমার সাহস হইয়াছে দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি।"

পার্ব্বতীর মুখমণ্ডল ঈষৎ মলিন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে গর্ব্বিত-ভাবে বলিল, "আমার ভয় কি? আত্মরক্ষা করিবার সাহস আছে!"

"তোমার সেই ছেলে-বেলার সাহস এখনও সমানই আছে দেখি-তেছি। কিন্তু তোমার ঐ ম্লান মুখখানি দেখিলে তোমাকে আর

ছেলেবেলার সদাপ্রফুল্ল পার্ব্বতী বলিয়া বোধ হয় না। তোমার বাল্য-কালের সেই সরল হাসিটি দেখিবার আশায় আমি এখনও বাঁচিয়া আছি।"

"বালাজীর, এই বিপদ; সে মিথ্যা মামলায় জেলে গিয়াছে, এখন কি আমার হাসিবার সময়!"

"সে অমন ভয়ানক কাজ করিতে গেল কেন? তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি একটুও নাই।"

"সে এ কাজ কখনই করে নাই। আমিও যেমনি জানি তুমিও তেমনি জান. সে আপনার প্রাণ বাঁচাইবার জন্যও কোন প্রকার অন্যায় কাজ করিতে পারে না।"

"আমি শুনিয়াছি, তাহার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।"

"আমি সে প্রমাণ গ্রাহ্য করি না। আমি জানি সে নিরপরাধ।"

"কিন্তু তোমার বিশ্বাস তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

"তা' নয় বটে।"

পার্ব্বতী অনেক চেষ্টা করিয়াও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না।

রাও সাহেব বলিলেন, "কাঁদিও না, পার্ব্বতী! তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়। বালাজীকে রক্ষা করিবার জন্য আমি চেষ্টার ত্রুটি করিব না।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে রাও সাহেব পার্ব্বতীর নিকটস্থ হইলেন এবং সহসা তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ভীতা কুপিতা পার্ব্বতী তাঁহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু রাও সাহেব তাহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়া মধুর বাক্যে তাহার মন ভুলাইবার নিমিত্ত বলিলেন, "পার্ব্বতী, আমার পার্ব্বতী, ছেলেমানুষী করিও না; এস বিবাদ মিটাইয়া ফেলি, আমি বালাজীকে রক্ষা

করিতে অঙ্গীকার করিতে পারি, যদি”—

পার্ব্বতী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “ছি, রাও সাহেব! ছি! আমাকে ছাড়িয়া দিন।”

“সেদিন আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে বালাজী আমাকে বাধা দিয়াছিল। আজি আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িবনা।”

পার্ব্বতী রাও সাহেবের দৃঢ় আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং রাও সাহেবও তাহাকে চুম্বন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় কে পশ্চাৎ হইতে সবলে রাও সাহেবের গলদেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে এমন প্রবলবেগে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল যে, গড়াইতে গড়াইতে কিয়দ্দূর গিয়া তবে তিনি পতনের বেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন।

গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কোপকুটিলনেত্রে আগন্তুকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাও সাহেব দেখিলেন, তাঁহার আততায়ী বালক মাত্র; সে তাঁহার ও পার্ব্বতীর মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বালকের ওষ্ঠে এখনও গুম্ফের রেখা দেখা দেয় নাই।

রাও সাহেব বালককে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে সে অবিচলিতকণ্ঠে বলিল, “সাবধান, রাও সাহেব! এখনও কি আপনার শিক্ষা হয় নাই?”

কিন্তু রাও সাহেব বালকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভীমবেগে তাহাকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। পার্ব্বতী ভয়ে হটিয়া গেল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইতে লাগিল, এইবার বুঝি সেই রক্ষাকর্ত্তা বালক তাহার সহৃদয়তার জন্য রাও সাহেবের হস্তে দণ্ডিত হয়। কিন্তু তাহা ঘটিল না। বালক স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। রাও সাহেব তাহার নিকটস্থ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই রাও সাহেবের নাসিকার উপরিভাগে ভ্রূসন্ধির মধ্যে সুকৌশলে বালক একটি

মুষ্ট্যাঘাত করিল। সেই এক আঘাত। সেই এক আঘাতেই রাও সাহেব পুনরায় ধরাশায়ী হইলেন।

পার্ব্বতী ভীতি-বিজড়িতকণ্ঠে বালককে বলিল, "চলে আসুন, চলে আসুন।"

"এতটা ব্যস্ত হইবার দরকার নাই। আপাততঃ ইনি আমাদের কোন অনিষ্টের চেষ্টা করিবেন না। কিন্তু কেবল আমার জন্যই কি তোমার ভয় হইতেছে? তোমার নিজের জন্য কি তোমার একটুও ভয় নাই।"

"আমার নিজের জন্য কোন ভয় নাই।"

আগন্তুক একটু অপ্রতিভভাবে বলিল, "তা' হলে বোধ করি আমার তোমাকে রক্ষা করিতে আসা অনর্থক হইয়াছে!"

পার্ব্বতী সলজ্জভাবে বলিল, "না মহাশয়, তা' নয়। আপনার সাহায্যের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ করিতেছি। আমার কথার অর্থ এই যে, রাও সাহেব প্রকাশ্যভাবে আমার কোন ক্ষতি করিতে সাহস করিবেন না। কারণ, তাহা হইলে সকলে তাঁহাকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু আপনাকে ত এ দেশের লোক বলিয়া বোধ হইতেছে না?"

এই সময়ে রাও সাহেবের জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি পার্ব্বতীর শেষ কথাগুলি শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি আগন্তুককে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "গায়ে পড়িয়া এই বে-আদবী করার ফল তোমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে।"

আগন্তুক হাসিয়া বলিল, "সে যাহা হয় হইবে। এখন আপনি আস্তে আস্তে পথ দেখুন।"

রাও সাহেব আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতী পুনরায় আগন্তুককে অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল।

আগন্তুক অবশেষে কহিল, "তুমি যখন বারংবার বলিতেছ, তখন আমাকে যাইতেই হইবে। কিন্তু তুমি কি এখনও এখানে থাকিবে? এখনও কি তুমি রাও সাহেবের নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা কর?"

"হাঁ মহাশয়।"

"কিন্তু তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, বালাজী তোমার কে?"

"প্রতিবাসী, সম্পর্কে ভাই।"

"তোমার ভায়ের বিপদেই রাও সাহেবের সুযোগ উপস্থিত হয় নাই কি?"

"কিন্তু মহাশয়——"

"আর এটাও কি সম্ভবপর নহে যে, বালাজীর এই নিগ্রহে রাও সাহেবের কিছু সম্বন্ধ আছে?

"না মহাশয়, তাহা অসম্ভব?

"কেন?"

"কারণ, বালাজী জাল নোট করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে।"

এই কথা বলিয়া আগন্তুকের উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি বলিল, "কিন্তু সে নির্দ্দোষ।"

আগন্তুক এ কথার কোন উত্তর না করিয়া বলিল, "রাও সাহেবের বর্ত্তমান আচরণ দেখিয়াও তুমি কিরূপে আশা করিতেছ যে, তিনি তোমাকে সাহায্য করিতে পারেন। আমি ইহার কিছুই এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।"

"রাও সাহেব আমাকে চিঠিতে লিখিয়াছেন যে, তিনি সাহায্য করিবেন। এই দেখুন সেই চিঠি। আমার সম্বন্ধে আপনার মনে কোনরূপ বিসদৃশ ধারণা জন্মে, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।"

আগন্তুক পত্রখানি পাঠ করিলেন, পত্রখানিতে লেখা ছিল :—

"স্নেহের পার্ব্বতী! আমি এইমাত্র বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াই শুনিলাম,

বালাজী জাল করার অপরাধে ধৃত হওয়ায় কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে। আমরা ছেলেবেলায় যেখানে খেলা করিতাম, সেই বটবৃক্ষের তলায় অদ্য সন্ধ্যার সময় তুমি অতি অবশ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সেই সময়ে আমি তোমাকে কিরূপে সাহায্য করিতে পারি, তাহা বলিব।"

পত্র-পাঠ শেষ করিয়া আগন্তুক বলিল, "রাও সাহেবের সাহায্যের মূল্যস্বরূপ তোমাকে কি দিতে হইবে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না?"

"তাঁহাকে যতটা মন্দ লোক বলিয়া দেখা যাইতেছে, আমি বাস্তবিক তাঁহাকে ততটা মন্দ লোক মনে করি না। আমি বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে জানি। তিনি অন্তরে মহৎ ও দয়ালু। কেবল কিছুকাল পুণায় বাস করিয়া তাঁহার এই অধঃপতন হইয়াছে।"

আগন্তুক অবিশ্বাসের সহিত মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকমাত্রেই কি একই ধরণের? তাহারা একবার যাহাকে বিশ্বাস করিবে, সে যে কখনও অবিশ্বাসী হইতে পারে, ইহা তাহারা কিছুতেই মনে করিতে পারে না।"

পার্ব্বতী প্রত্যুত্তর করিল, "কি করি, বলুন? বালাজী এই বিপদে পড়িবার পর হইতেই তাহার সকল বন্ধু তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

"তুমি বালাজীর কথা যেরূপ বলিতেছ, সে যদি বাস্তবিক সেইরূপ লোক হয়, তাহা হইলে রাও সাহেব যেরূপ ভয় প্রদর্শন করিলেন, তাহার সেইরূপ যাবজ্জীবন কারাগারে বাস করাই উচিত। তুমি যে তাহার প্রতি দয়ার উদ্রেক করিবার জন্য রাও সাহেবের মত লোকের নিকট প্রার্থনা করিবে, ইহা তাহার পক্ষে কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে।"

"সেও এই কথাই বলিত। সেও আপনারই মত রাও সাহেবকে অবিশ্বাস করে।"

"আর তুমি, তুমি স্ত্রীলোক—কচি মেয়ে বলিলেই হয়—তুমি তোমার সরল হৃদয়ের গতি-অনুসারে রাও সাহেবের মত বদমায়েসের চরিত্রসম্বন্ধে ভালমন্দ ধারণা করিতে সাহস কর! তাঁহাকে কি তোমার একটুও অবিশ্বাস হয় না?"

"রাও সাহেবকে বিশ্বাস করিতে পারি না বটে, কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হইয়াছি বলিয়া রাও সাহেবের সাহায্য লইতে স্বীকার করিয়াছি। তিনি ইচ্ছা করিলে বালাজীকে রক্ষা করিতে পারেন। আর আমার নিজের কথা যদি বলেন, তবে আমাকে আপনি যতটা অসহায়া মনে করিতেছেন আমি বাস্তবিক ততটা সহায়হীনা নহি। এই দেখুন,—ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন, আমি রাও সাহেবকে কতখানি বিশ্বাস করি।"

এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী তাহার বক্ষ হইতে একখানি ক্ষুদ্র ছোরা বাহির করিয়া আগন্তুককে দেখাইল। আগন্তুক প্রশংসাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে সে তোমাকে অপমান করিতে পারে, ইহা জানিয়া শুনিয়া তুমি তাহার নিকটে সাহায্য পাইবার আশায় আসিয়াছিলে?"

"হাঁ মহাশয়।"

"কিন্তু তুমি এখনও এটুকু বুঝিতে পার নাই যে, তোমাকে অপমান করিবার সুযোগ পাইবে বলিয়াই সে বালাজীকে সাহায্য করিবার লোভ দেখাইতেছে। সে যে ধনী বলিয়া অপরের অপেক্ষা বালাজীর বেশী উপকার করিতে পারে, এরূপ মনে করিও না। কাহারও সাহায্যের যদি নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যে কোন গরীব লোকেও তাহার জন্য সেটুকু করিতে পারে।"

"বলেন কি? আপনি ঠিক জানেন?"

"ঠিক জানি।"

আগন্তুকের কথা শুনিয়া পার্ব্বতী অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিল। আগন্তুকের মুখ দেখিয়া তাহার প্রতীতি জন্মিল যে, সে সত্য কথাই বলিতেছে। অনন্তর সে একবার আকাশের দিকে উদাসদৃষ্টিতে চাহিল। যেন তাহার সমস্ত আশা-ভরসা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অবশেষে সে বলিল, "তবে চলুন, আর এখানে বিলম্ব করা নিরাপদ নহে। রাও সাহেব হয় ত এখনি লোকজন লইয়া আসিয়া পড়িবে।"

পার্ব্বতীর কথা শুনিয়া আগন্তুকের হাসি আসিল। কিন্তু হাসি দমন করিয়া সে সুবোধ বালকের ন্যায় পার্ব্বতীর অনুসরণ করিল। এইরূপে নিস্তব্ধভাবে কিয়দ্দূর গমন করিবার পর আগন্তুক সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "বালাজীকে তুমি নিরপরাধ মনে কর কেন?"

"আমি তাহাকে ভালরূপই জানি, সে কখন অন্যায় কাজ করিতে পারে না।"

"ঐ কথা বলিয়া তুমি তোমার নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পার; কিন্তু কেবল তোমার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমি ত সন্তুষ্ট হইতে পারি না। স্ত্রীলোকেরা তাহাদের স্নেহাস্পদের দোষ-গুণের সম্বন্ধে অন্ধ, তাহা ত আমি বেশ জানি।"

"কিন্তু আপনি যদি তাহাকে জানিতেন, তাহা হইলে আপনিও নিশ্চয় তাহাকে নিরপরাধ মনে করিতেন।"

পার্ব্বতী নিতান্ত আগ্রহের সহিত এই কথাগুলি বলিল। যেন সে তাহার নিজের বিশ্বাসের বলে বালাজীর এই অযাচিত বন্ধুত্বকে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। তাহার মনে মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, আগন্তুক বালক হইলেও বালাজীকে রক্ষা করিবার শক্তি তাহার আছে; কিন্তু কেন তাহার মনে এরূপ ধারণা জন্মিল, সে তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

পার্ব্বতীর মনোভাব আগন্তুকের অজ্ঞাত রহিল না। সে গম্ভীর ভাবে কহিল, "আমি যদি বালাজীকে জেল হইতে খালাস করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে তোমরা দু'জনে যাহা জান সকল কথা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিবে?"

"সমস্ত কথাই বলিব।"

"তাহা হইলে তুমি যাহা জান, তাহা' আমাকে এখন বল। আমি পরে বালাজীর সঙ্গে দেখা করিব।"

"কিন্তু জেলের লোকেরা আপনাকে বালাজীর সঙ্গে দেখা করিতে দিবে কেন?"

"সেজন্য তোমার কোন ভাবনা নাই।"

পার্ব্বতী সহসা কোন উত্তর করিল না। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া আগন্তুক বলিল, "আমি কে তাহা না জানিয়া আমাকে তোমার কোন কথা বলিতে ভরসা হইতেছে না। আমার পরিচয় জানিবার জন্য এখন ব্যস্ত হইও না; উপযুক্ত সময়ে আমার পরিচয় পাইবে। এখন কেবল এইটুকু জানিয়া রাখ যে, তোমরা উভয়েই যদি আমার নিকট সত্য কথা বল, আর আমি যদি বুঝিতে পারি যে, বালাজী নির্দ্দোষ,—তাহা বুঝিতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না, তাহা হইলে আমি আদালতে বিচারের সময়ে বালাজীকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিব।"

—:o:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।



পার্ব্বতী তখন বিশ্বস্তচিত্তে বলিতে আরম্ভ করিল, "বালাজী লোহার কারখানায় হিসাব-রক্ষকের কাজ করিত। গত শনিবারে আফিসের ছুটির পর সে তাহার সাপ্তাহিক বেতন লইয়া মুদির দোকানে কিছু জিনিসপত্র কিনিতে যায়। জিনিসগুলির দাম দিবার জন্য সে মুদির হাতে একখানি নোট দিলে মুদি উহা জাল নোট বলিয়া ফিরাইয়া দেয়। বালাজী নোটখানি হাতে লইয়া উহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারে যে, নোটখানি বাস্তবিকই জাল। তখন সে একখানি ভাল নোট বাহির করিয়া দেয়। এ অঞ্চলে জাল নোটের অত্যন্ত প্রচলন দেখিয়া কোথা হইতে এত জাল নোটের আমদানী হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য সরকার বাহাদুর বিশেষভাবে একজন লোককে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বালাজী দোকান হইতে বাহির হইয়া বাড়ীর দিকে কিছুদুর আসিলে এই সরকারী লোকটি পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাড়াতাড়ি আসিয়া বালাজীকে দাঁড়াইতে বলে।"

আগন্তুক বলিল "বালাজী যে জাল নোট চালাইতে গিয়াছিল, তাহা ঐ লোকটি এত শীঘ্র কি করিয়া জানিতে পারিল ?"

পার্ব্বতী। "ঐ দোকানে কেহ জাল নোট ভাঙ্গায় কি না তাহা দেখিবার জন্য লোকটি মুদীর দোকানেই অপেক্ষা করিতেছিল।"

"বালাজীর উপর সন্দেহ হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলে কি ?"

"না; তাহা হইলে লোকটি হয় ত দোকানেই বালাজীকে গ্রেপ্তার করিত। সেই লোকটি বালাজীর নিকট আসিয়া প্রথমে তাহার নোটগুলি দেখিতে চাহে। বালাজী তাহার টাকার ব্যাগটি বাহির করিলে সেই লোকটি ব্যাগটি নিজের হাতে লইয়া নিজেই

জাল নোট বাছিয়া লয়। বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বালাজীর নিকট তাহার মাহিনা অপেক্ষা বেশী টাকা ছিল এবং তাহার নিকট অনেকগুলি জাল নোটও পাওয়া গিয়াছিল।”

“হুঁ।”

“শুধু ইহাই নহে। বালাজীর কাপড়-চোপড় অনুসন্ধান করা হইলে তাহার কোটের আস্তরের সহিত সেলাই করা আরও অনেকগুলি জাল নোট পাওয়া গিয়াছিল।”

“এটি ত বড় ভাল লক্ষণ নয়।”

“এটি নিশ্চয় তাহার কোন শত্রুর কাজ।”

“তাহার শত্রুসংখ্যা কি এতই বেশী?”

“পূর্ব্বে তাহার একজনও শত্রু ছিল বলিয়া আমি জানিতাম না। কিন্তু এখন তাহার মা আর আমি ছাড়া তাহার আর কোন বন্ধু নাই।”

“কিন্তু সকলেই এ সময়ে একযোগে তাহাকে ত্যাগ করিল কেন?”

“কারখানার টাকাকড়ি বালাজীর হাতেই থাকিত। লোকজনকে সে নিজ হস্তে মাহিয়ানা দিত। এই সকল লোকের মাহিয়ানার টাকার ভিতর হইতেও প্রায়ই জাল নোট বাহির হইত। সেইজন্য তাহারা তাহার শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। লোকের সন্দেহ হইয়াছিল যে, সে ভাল নোটের পরিবর্ত্তে জাল নোট চালাইতেছে।”

“তাহার বাড়ীতে কি কোন জাল নোট বাহির হইয়াছে?”

“না মহাশয়?”

“আচ্ছা, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তুমি বলিয়াছিলে, রাও সাহেব আর একবার তোমার অপমান করিয়াছিল। তাহার কারণ কি?”

“রাও সাহেব, বালাজী আর আমি, এই তিন জনে ছেলেবেলায় খেলা-ধূলা করিয়াছি। তখন রাও সাহেব আমার চেয়ে এমন কি

বালাজীর চেয়েও চরিদ্র ছিলেন। তাঁহার পিতামহের আমল হইতেই তাঁহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি বাস্তু ভিটা পর্য্যন্ত বন্ধক ছিল। সুদের সুদে এত বেশী টাকা ঋণ দাঁড়াইয়াছিল যে, জমিদারীর আয় হইতে সুদ পর্য্যন্ত পোষাইত না। গত দুই বৎসর হইল, রাও সাহেব সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়াছেন।"

"এই টাকা কোথা হইতে আসিল ?"

"শুনিয়াছি, কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের মৃত্যুতে রাও সাহেব তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।"

"নিশ্চয়ই অনেক টাকা ?"

"হাঁ। রাও সাহেবের খরচ বিস্তর। এখানকার বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য অনেক খরচ হয়, তা ছাড়া তাঁহার একখানি ছোট ষ্টীমার আছে, মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তিনি ঐ ষ্টীমারে চড়িয়া আমোদ করিয়া সমুদ্রে বেড়াইতে যান। তাহাতেও খরচ অল্প হয় না।"

আগন্তুক কেবল বলিল, "হুঁ"।

পার্ব্বতী বলিতে লাগিল, "রাও সাহেবের বয়স যখন ১৮ বৎসর, তখন তিনি পুণায় লেখাপড়া শিখিতে যান। দুই বৎসর পরে তিনি যখন ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। গ্রামে থাকিতে তিনি সাদাসিদা মোটা কাপড়চোপড় পরিতেন, এখন তিনি বহুমূল্য পোষাক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই রকম, সকল বিষয়েই তাঁহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। আমাদের পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ হওয়া অবধি তিনি আমাকে অনেক আদরের অনেক ভালবাসার কথা বলেন। কিন্তু তাঁহার সেই ছেলেবেলাকার সরল ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে বেশী কথা-বার্ত্তা কহি নাই ; সেই সময় হইতে আমি আর তাঁহার সঙ্গে দেখাও

করিতাম না। কয়েক দিন পরে তিনি আবার পুণায় গমন করেন। ছয় মাস পরে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার আরও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম, তাঁহার পূর্ব্বেকার সেই দরিদ্র অবস্থা নাই, তিনি এখনও দুই হাতে টাকা খরচ করেন। একটু একটু মদ্যপান করিতেও শিখিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব-চরিত্র-সম্বন্ধে এমন সকল সংবাদ আসিতে লাগিল, যাহা আমি আপনাকে বলিতে পারিব না। একদিন আমি গ্রামের অপর দিকে আমার সঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় পথে রাও সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। সে সময় পথে অপর কোন লোক নাই দেখিয়া রাও সাহেব আমার হাত ধরেন। আমি হাত ছাড়াইয়া লইতে গেলে তিনি আমাকে সবলে টানিয়া লইয়া যাইতে চাহেন। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলে বালাজী কোথা হইতে আসিয়া পড়ে। আজ আপনি রাও সাহেবের যেরূপ নিগ্রহ করিয়াছেন, বালাজীর হাতে সেদিনও রাও সাহেবের সেই রকম দুর্দ্দশা হইয়াছিল।"

"আচ্ছা, আজ তুমি বাড়ী যাও। আমি এ গ্রামের কাহারও সঙ্গে আপাততঃ দেখা সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি না। তোমার সঙ্গে যে আমার কথাবার্ত্তা হইল, ইহাও কেহ যেন না জানিতে পারে।"

"আপনি বালাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন ?"

"আজ রাত্রিতেই।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

বাঁশী।

ওই বুঝি বাঁশী বাজে!

কে যা'বে তোমরা এস গো ছুটিয়া?

এস গো সকলে বাঁধন টুটিয়া,—

পরিহরি মূঢ় লাজে!

ওই বুঝি বাঁশী বাজে!

তটিনীর কূলে বাজায় বাঁশরী

সমীরে ভাসিয়া খেলিয়া লহরী

পরাণেতে সুখে রাজে!

ওই বুঝি বাঁশী বাজে!

(ওযে) আবাহন তাঁর, প্রেমময় যিনি

মধুময় স্বরে ডাকিছেন তিনি

এস! এস প্রেম সাজে!

ওই শুন বাঁশী বাজে!

ভবপার তরে এসেছে যে তরী,

সঙ্কেতে তাই ডাকিছে শ্রীহরি

চল ত্যজি বৃথা সাজে!

ওই শুন বাঁশী বাজে!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা—১৯নং ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান, "বিষ্ণু-প্রেস" হইতে
শ্রীবিষ্ণু পদ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। ২য় সংখ্যা।

অঞ্জলি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী দত্ত।

লেখকগণের নাম—

শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ দাস, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীমতী—
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী,
শ্রীমতী উষাবালা ও সম্পাদক।

সূচী।

কার্য্যালয় :—৮৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ম্যানেজার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে।

ডাক মাশুলসহ বার্ষিক মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

এই সংখ্যার মূল্য ৴০ আনা।

নিয়মাবলী।

১। "অঞ্জলি"র বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১২ সংখ্যা ডাকমাশুল সহ ১৲ একটাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা মাত্র ডাকযোগে বা লোক মারফতে "অঞ্জলি"র বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। "অঞ্জলি" প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ মধ্যে প্রকাশিত হয়। মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্ত হইলে উক্ত তারিখেই "অঞ্জলি"র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র দিলে তাহার তদন্ত ও প্রতিকার করা হয়।

৩। গ্রাহকগণ কোন পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৪। কেহ স্থান পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে এবং বিজ্ঞাপন দাতাগণ বিজ্ঞাপন বদল করিতে চাহিলে পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে তাহা আমাদিগকে জানাইবেন। নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৫। 'বেয়ারিং' বা 'ইন্‌সাফিসিয়েণ্ট', পত্রাদি গৃহীত হয় না। ষ্ট্যাম্প বা রিপ্লাই কার্ড ব্যতীত পত্রোত্তর দেওয়া যায় না। লোক পাঠাইলে লোক মারফতেও উত্তর দেওয়া যায়। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং চিঠিপত্র টাকা কড়ি বিনিময়ে সাময়িক পত্র ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

বিজ্ঞাপনের হার।

মলাটের ৪র্থ পৃষ্ঠা ৪৲ টাকা, মলাটের ৩য় পৃষ্ঠা ২৲ টাকা, মলাটের ২য় পৃষ্ঠা ২৲ টাকা, সাধারণ প্রতি পৃষ্ঠা ১॥০ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৸০ আনা।

শ্রীবিষ্ণুপদ দাস।
প্রকাশক—
১৯ নং ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান কলিকাতা।



পার্ব্বতী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ছি, রাও সাহেব! ছি! আমাকে ছাড়িয়া দিন।" (চক্রভেদ ২১ পৃষ্ঠা)

অঞ্জলি।

১ম বর্ষ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ সাল।	২য় সংখ্যা।

জয় রাধাকৃষ্ণ !

কত মাসিক পত্রিকা উঠিয়া দুই দিন পরে 'একেবারে উঠিয়া' গেল। যেন অকাল মৃত্যুর জন্যই তাহাদিগের জন্ম পরিগ্রহ। কাহার লীলা খেলা দুই এক মাসের জন্য। কেহবা বিজ্ঞাপনাম্বরসায়নের বলে জোর এক বৎসরকাল 'ক্রনিক ডিজিজে' ভুগিতে থাকে তারপর 'কবিরাজেরা' আর যখন ঔষধ দেন না রোগী মরিয়া যায়। আবার দেখিতে পাই কেহ কেহ একটা মস্ত উদ্দেশ্য লইয়া অবতারের মত উপস্থিত হন—এ বলে আমি শান্তি পথে গিয়ে ভ্রান্তি ঘুচাব ; ও বলে আমি উপবীত গ্রহণ করিব, সে বলে বিলাত ফেরতদের জাতে লওয়া হইবে না। ওরে বাবারে ! কি চিৎকার, কান ঝালা পালা ক'রে দেয়। আবার দুদিন পরে দেখা যায় ছেলেরা যেমন 'কেঁদে কেটে' ঘুমাইয়া পড়ে আমার পত্রিকা দিদিরাও চিরনিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করে। এসব দেখিয়া শুনিয়াও আমরা এ কার্য্যে কেন হস্তক্ষেপ করিতেছি যদি জিজ্ঞাসা করেন, উত্তরে আমরাও জিজ্ঞাসা করিব, "জ্বালাময় সংসার, বিষময় সংসার ; কি ছার আর কেন মায়া" এ সকল জানিয়া শুনিয়াও লোকে কেন সংসারে প্রবৃত্ত হয়। কি জানেন, এ একটা খেয়াল বলুন খেয়াল, মোহ বলুন মোহ, আর যাই বলুন তাই। আপনারা মূর্খদিগের পাগলামী দেখে হাসিবেন তা আমরা বুঝি, হয়ত 'রিমার্ক' করিবেন ;

যে, পিপিলিকা মারিবার তরেই পাখা ধরে।' আচ্ছা, সে নিজে ইচ্ছা করিয়া ধরে, না তাহাকে কেহ ধরায়? কিছু বুঝিতে না পারিলে আমরা শেষে বলি, কর্ম্ম ফলেই সব হয়। আমরাও কর্ম্ম ফলেই আপনাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি মনে করুন। এখন যাহা দিবার তাহা দিন। তবে দেখিবেন, যেন 'ধনঞ্জয়' দিবেন না। দোহাই! জয় রাধাকৃষ্ণ প্রভু ধনঞ্জয়!

শ্রীবিষ্ণু পদ দাস।

গুরু নানক।

শিখ-সম্প্রদায়ের পরমপূজ্য গুরু নানক ১৪৬৮ খৃঃঅব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জন্মবৃত্তান্ত অতি আশ্চর্য্য ঘটনামূলক। ইঁহার পিতৃদেব কাল্লুর কোন অপত্য না হওয়ায়, পুত্রকামনায় ফকিরি অবলম্বন করেন; একদিন কাল্লুর আবাসে একটি বৃদ্ধ ফকির অতিথি হন। কাল্লু ইহাঁর সসম্ভ্রম সৎকারাকাঙ্ক্ষায় বহু যত্নপূর্ব্বক পবিত্রভাবে ভোজনের আয়োজন করিয়া দিলেন। উক্ত ফকির ভোজনাবসানে ভুক্তাবশিষ্ট একত্রিত করিয়া কাল্লুর হস্তে দিয়া বলিলেন, 'যাও বৎস! তোমার পত্নীকে এইগুলি আহার করিতে দাও, ইহা ভোজনে তোমার স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হইবে এবং অনুপম পুত্রসন্তান লাভ করিবে।" কাল্লু প্রফুল্লান্তঃকরণে ভক্তিগদগদচিত্তে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, বৃদ্ধ ফকিরের পদধুলি গ্রহণান্তর স্বকীয় ভার্য্যাকে পবিত্রহৃদয়ে প্রসাদ সেবন করাইলেন। কিছুকাল পরে জগৎপিতা জগদীশ্বরের অনুকম্পায় কাল্লু পত্নীর গর্ভ সঞ্চার হইলে তদীয় পিতা কন্যাকে কুটকুচুয়ার অন্তর্গত মারি নামক গ্রামে স্বীয় আবাসে লইয়া যান। এই স্থানেই মহাভাগ

নানকের জন্ম হয়। শৈশব হইতেই নানকের ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জন্মায়। চারি বৎসর বয়ঃক্রমে সন্নিকটস্থ পাঠাগারের গুরুমহাশয়কে ইনি জিজ্ঞাসা করেন, "ঈশ্বর কোথায়?" শিক্ষক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অতঃপর ইহার জন্মবৃত্তান্তের আশ্চর্য্যতর ঘটনা শ্রবণান্তর ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া ফকিরি অবলম্বন করিলেন।

বালক নানক-হৃদয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঈশ্বর কে? ঈশ্বর কোথায়? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন, এবং যাহা কিছু পাইতেন, ফকিরদিগকে বণ্টন করিয়া দিতেন।

একদা নানকের পিতা ব্যবসায় জন্য তাঁহাকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া উক্ত অর্থে লবণ ক্রয়পূর্ব্বক স্থানান্তরে বিক্রয় করিতে উপদেশ দিলেন। নানক অর্থ লইয়া বহির্গত হইলে পথিমধ্যে কতিপয় ফকির আসিয়া তাঁহার নিকট অভাব জানাইল, নানক তৎক্ষণাৎ ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত ফকিরগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ আমার পিতা আমাকে ব্যবসা করিয়া লাভের জন্য লবণ খরিদ করিতে কিছু অর্থ দিয়াছেন। ব্যবসার দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করা আমার অভিপ্রেত নহে। দরিদ্রের দুঃখমোচন করা ইহা অপেক্ষা শতগুণে বাঞ্ছনীয়; অতএব আমার নিকট যৎকিঞ্চিৎ আছে, নির্ব্বিকার হৃদয়ে গ্রহণ করুন।" তাঁহাদের মধ্যে বালাশবি নামে জনৈক পরিব্রাজক বলিলেন, "আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হউক; শুভকার্য্যে বিলম্ব করিবেন না।" নানক ঐ অর্থ সম্প্রদান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তাঁহার পিতা অতিশয় কুপিত হইয়া তাঁহাকে যৎপরনাস্তি তিরস্কার করিলেন তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পিতৃসমক্ষে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। নানক যখনই সুযোগ পাইতেন, দরিদ্রের দুঃখমোচনে সহায়তা করিতেন।

নানকের পিতা স্থির করিলেন, বিবাহ ব্যতীত নানককে সংসারী করা এক প্রকার অসম্ভব। অতএব অনতিকাল বিলম্বে নানকের উদ্বাহকার্য্য সুসম্পন্ন করাইলেন। নানকও অনতিকাল বিলম্বে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করিলেন।

নানকের ধর্ম্ম একপ্রকার হিন্দু মুসলমানের সংমিশ্রণ। তিনি হিন্দুকে বলিতেন, "মুসলমানকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিও না।" আবার মুসলমানকে বলিতেন, "কাফের বলিয়া হিন্দুকে ঘৃণা করিও না।" শান্তিস্থাপনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি বলিতেন, হিন্দু মুসলমান একই পিতার পুত্র হইয়া পরস্পর দ্বন্দ্ব করিবে কেন? ভ্রাতৃবিরোধেই পিতৃকুল নষ্ট হয়।

নানক একেশ্বরবাদী ছিলেন, তাঁহার মতে যতদিন পৃথিবীতে কেবলমাত্র এক ধর্ম্মসম্প্রদায় সংস্থাপিত না হয়, ততদিন পরস্পর বিদ্বেষ ও বিরোধ মিটিবে না।

নানকের জীবনীপাঠে অনেক আশ্চর্য্যমূলক আখ্যান অবগত হওয়া যায়। একদা নানক অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী শুনিলেন, "নানক অগ্রসর হও।" নানক ভক্তিবিহ্বলহৃদয়ে বলিলেন, "জগদীশ্বর আমার কি ক্ষমতা যে, আমি আপনার পথে অগ্রসর হই।" দৈববাণী হইল, "নানক! আমি তোমাকে কলিযুগে আমার কার্য্যের জন্য পাঠাইয়াছি।" নানক প্রত্যুত্তর করিল, "হে দয়াল প্রভু! যদি আমি অমর হই, এবং চন্দ্রসূর্য্য আমার চক্ষু হয়, তাহা হইলেও হে সর্ব্বশক্তিমান্! তোমার কার্য্য কিছুই করিতে পারিব না।" দৈববাণী হইল, "আমি তোমার গুরু, কিন্তু তুমি সমগ্র মানবজাতির গুরু হইবে।" তোমার শিষ্যগণকে গুরু নাম আরাধনা করিতে বলিবে; আমি তাহাদের উদ্ধার করিব। তুমি তোমার শিষ্যগণকে তিনটি উপদেশ দিবে, যথা:—"আমাতে ভক্তি, জীবে দয়া, এবং বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি"

আর বলিবে অহিংসা পরম ধর্ম্ম ; কারণ যেখানে প্রাণী সেখানে আমি, যেখানে জীবাত্মা সেখানে পরমাত্মা, যেখানে পরমাত্মা, সেইখানেই জীবাত্মা।" এই বলিয়া পরমাত্মা অন্তর্হিত হইলেন, এবং নানক গুরুনাম উচ্চারণ করিতে করিতে বহির্গত হইলেন।

নানক জীবনে অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে নিম্নে একটির আখ্যান দেওয়া গেল। একদা নানক শিষ্যগণের সহিত তুঙ্গ নামক একটি গ্রামে যান। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বুদ্ধু নামে জনৈক শিষ্যকে জল আনিতে বলিলেন। বুদ্ধু বলিলেন, "তথায় কোন পুষ্করিণী নাই!" নানক বলিলেন, "কেন এই সন্নিকটেই ত একটি পুষ্করিণী দেখিয়াছি।" বুদ্ধু উত্তর করিলেন, "তিনি প্রত্যূষে তথায় গিয়াছিলেন এবং দেখিয়াছিলেন, সে পুষ্করিণী পঙ্কে পরিপূর্ণ; তাহাতে একবিন্দুও জল নাই।" নানক বলিলেন, "আর একবার যাও, এক ঘটিও কি পাইবে না? আমি বড় তৃষ্ণার্ত্ত।" বুদ্ধু যাইল এবং সবিস্ময়ের দেখিল, পুষ্করিণী নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ। নানক এইরূপ আশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বহু শিষ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক এক সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া ১৫৩৯ খৃঃঅব্দে ৭১ একাত্তর বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। তিনি প্রায় ৬১ বৎসর গুরুর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি মন্দির রাবীনদীর ধারে (কীর্ত্তিপুরে) এখনও বর্ত্তমান। বৎসরান্তর তাঁহার সমাধির দিবসে সেখানে উৎসব হয়।

প্রার্থনা।

"ভগবন্—ভগবন্, এই শেষ নিবেদন,
চরণে তোমার—
করেছি অনেক পাপ, সয়েছি অনেক তাপ
লইয়া সংসার।
এই মায়া মোহ ক্লেশ এইখানে হোক শেষ
তুমি যেন আর—
একটী একটী করি', ন্যায় তুলাদণ্ড ধরি'
ক'রো না বিচার!
আজি বহুদিন পরে ভ্রান্ত পুত্র ফেরে ঘরে,
তুমি পিতা তার—
সব অপরাধ ভুলে', লও—লও বুকে তুলে
আগ্রহে আবার!"

শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল।

মিলন।

(আধুনিক অনুকৃতি।)

আমি যখন দত্তপুকুরের প্রকাশবাবুর বাড়ী 'প্রাইভেট্ টিউসনি' করি তখন প্রকাশ বাবুর আশ্রিতা সেই অনাথা বালিকাটির উপর আমার যেন কেমন একটা আন্তরিক ভালবাসা পড়িয়া উঠিতেছিল। তৎপূর্ব্বে আমার উদ্বাহক্রিয়া সমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া তাহার উপর ভালবাসাটাকে নিরন্তর তাড়াইতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু শরতের মেঘের ন্যায় তাহার প্রেমটুকু হৃদয়াকাশে "উড়ে এসে জুড়ে"

বসিত। কে জানে কেন মধ্যে মধ্যে তাহাকে নয়নের তারার ভিতর দেখিতে পাইতাম; বায়ুর সহিত তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতাম; অতীব কোমল জিনিসস্পর্শে তাহার স্পর্শ অনুভব করিতাম; প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে তাহার সৌন্দর্য্যে উপলব্ধি করিতাম এবং তাহাকে দেখিয়া প্রাণের মধ্যে কিরূপ একটা মোহময় বিহ্বলতা জন্মিত।

আমি কখন কখন তাহার সহিত কথা কহিতাম, কখন ও বা একটু পড়া বলিয়া দিতাম বা সময় বিশেষে তামাসা করিতে চেষ্টা পাইতাম—কিন্তু হায়! সে আমার ন্যায় হতভাগ্যের তামাসায় যোগ দিত না। তাহার ক্ষীণ-গম্ভীর মূর্ত্তিখানি দেখিয়া মনে করিতাম—এই গাম্ভীর্য্যের মধ্যে সেই সরলতামাখা প্রফুল্ল ও নবীন ভাবটুকু থাকিত, এই চিন্তা-পূর্ণ নয়নের মধ্যে সেই চঞ্চলভাবটুকু থাকিত; এই উদাস ভাবের ভিতর যদি সেই সেই সাহস ভাব থাকিত; এই রুগ্নকায়া যদি আর একটু সুগোল, সুঠামও নধর হইত; ওই ভ্রমর—কৃষ্ণ কুন্তল যদি আর একটু কুঞ্চিত ও আনিতম্ব লম্বিত হইত; ওই বীনানিন্দিত স্বর যদি আর একটু শ্রুতি মধুর হইত—তাহা হইলে—যে তাহারই মূর্ত্তি হইত!

একদিন সন্ধ্যাকালে আমার অস্পষ্ট আলোকময়—নির্জ্জন গৃহে আসিয়া সে যখন বিষণ্ন বদনে জিজ্ঞাসা করিল "কি ভাবিতেছ মাষ্টার বাবু? আপনার মুখে সর্ব্বদাই যেন একটা চিন্তার মলিন চিহ্ন লাগিয়া রহিয়াছে। কারণ কি বলুন দেখি?" তখন আমি আর না—বলিয়া থাকিতে পারিলাম না—বলিলাম "সে অব্যক্ত হৃদয়ের ব্যথার কথা আপনি শুনিয়া কি করিবেন?" 'পি'ও (তাঁহার সম্পূর্ণ নাম তখন আমার অজ্ঞাত ছিল) ছাড়িবার পাত্রী নহে, সে সজল নয়নে বলিল "আপনি তাহা হইলে আমাকে নিতান্তই পর ভাবেন?" আমি উৎকণ্ঠার সহিত বলিলাম "মিথ্যা কথা! আপনার ন্যায় বিশ্বাসী বন্ধু জগতে আর নাই। আমার হৃদয়ের সব কথা আপনাকে খুলিয়া বলি শুনুন—"

আমি ক্যালিফর্ণিয়া হইতে গোপালনবিদ্যা শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় আসিয়া। মনে করিলাম একটা ডেয়ারী ফারম খুলিব। তাই কিছুদিন ক্যালিফর্ণিয়া প্রত্যাগত বন্ধুবর শরৎ বাবুর বাসায় এ বিষয়ে তাহার নিকট হইতে পরামর্শ ও উপদেশ প্রাপ্তির আশায় রহিলাম।

"তাঁহার বাসায় তিনি, তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার একটিমাত্র ভগ্নি প্রতিভা–" মনোরমা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। তারপর আত্ম সংযম করিয়া বলিল "বেশ তারপর ?"

"একদিন সে আমার নিকট স্কটের ১টী কবিতার নিম্নাংশ বুঝিতে আসিল :—

Where shall the lover rest
Whom the fates sever
From his true maidens breast
Parted for ever ?

"বুঝাইয়া দিলাম ; সে আমার দিকে একটু তাকাইয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। ইহা হইতেই তাহার প্রতি আমার ভালবাসার স্ত্রপাত! কিছুদিন পরে আমি শরৎ বাবুর নিকট প্রতিভার কর—প্রার্থনা করিলাম। শরৎ বাবু বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমাদের দুজনের বিবাহ হইয়া গেল। কি জানি আমাদের বিবাহ শুভ লগ্নে কি কুলগ্নে হইয়াছিল!

"বিবাহের পর আমরা গঙ্গার ধারে একটা বাসা ভাড়া করিয়া দুই চারিদিন সুখে বাস করিলাম। প্রতি রাত্রে আমরা পূতসলিলা গঙ্গার নির্ম্মল বক্ষে নৌকা চড়িয়া বেড়াইতাম। কখন কখন নৌকার মধ্যে আমি বেহালা বাজাইতাম—প্রতিভা গান করিত। সে গানের মধুর ঝঙ্কার বায়ুতে মিশিয়া কোথায় যাইত জানি না। কিন্তু

আমাদের সুখে দৈবের ব্যাঘাত ছিল, তাই একদিন পূর্ণিমা নিশীথে প্রতিভার সহিত নৌকা করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ আমার এত সাধের প্রতিভাসুন্দরী গঙ্গার জলে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঝাঁপাইয়া পড়িলাম কিন্তু জোয়ারের জলে তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশেষে নিরাশ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তীরে আসিলাম। ডেয়ারী ফারম খোলার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া টিউসনি করিতেছি। তাহারি বিরহে আজ পর্য্যন্ত জীবন দগ্ধ হইতেছে।"

আমার দুঃখের কাহিনী শেষ হইলে 'পি' হাঁসিয়া বলিল "আমাকে বিবাহ করিয়া দগ্ধ জীবন শীতল করুন না কেন?" আমি তাহার অসঙ্গত বাক্যে আশ্চর্য্যের সহিত কিঞ্চিৎ রাগান্বিত ও লজ্জিত হইলাম।

সে বলিল "কিছু মনে করিবেন না—আমিই সেই প্রতিভা। প্রকাশ বাবুই আমাকে গঙ্গা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রকাশ বাবু আমার পিতার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। উনি বাল্যকালে আমাকে আদর করিয়া ডাকিতেন 'পি' আমি আপনাকে পূর্ব্বে দেখিয়াই একটু চিনিতে পারিয়াছিলাম। পূর্ব্বাপেক্ষা আপনার চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না।—হারান রতন পুনরায় কুড়াইয়া পাইয়া কারই বা না আনন্দ হয়? আমি ভগবানকে অন্তরের মধ্যে ডাকিয়া বলিলাম—"ধন্য তোমায়? তোমায় নমস্কার! তুমি আমার প্রাণের প্রতিমাকে পুনরায় মিলাইয়া দিয়াছ!"—আমি আগ্রহে প্রতিভার জ্যোৎস্না—বিকশিত মুখে প্রাণ ভরিয়া চুমিলাম।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

—*—

শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়,

সবিনয় নিবেদন মিদং—

আজকাল মাসিকপত্রে অনেক শ্রীমতীদিগের লেখা দেখিতে পাই। আমি ইংরাজী জানি না, ছোট গল্প লিখিতে জানি না, তত্রাচ আমার একটু লেখবার সখ হইয়াছে। কোথা হইতে 'টুকিব' বুঝিতে না পারিয়া 'আড়ি পাতিয়া'—সঙ্গিনীদিগের বিষয় যাহা জানিয়াছি যতদূর স্মরণ হয় তাহার মধ্যে কিছু কিছু আপনার নিকট পাঠাইবার ইচ্ছা রহিল। পাঠকপাঠিকাগণের ভাল লাগিবে কিনা জানি না। নমুনা স্বরূপ 'মনের কথা' নামে একটী বিষয় পাঠাইলাম। সাধারণের তৃপ্তিকর হইয়াছে জানিতে পারিলে পরে আরও লেখার বাসনা রহিল। ইতি—২৩ বৈশাখ ১৩২১।

নিবেদিকা—

শ্রীমতী—দাসী।

মনের কথা।

স্নেহলতাকে বাধা দিয়া সরলা বলিল "বলতে নাই, পতি পরম-গুরু। তিনি যতই করুন না কেন, তিনি আমার সর্ব্বস্ব, তিনি থাকতে ভুগচি, কষ্ট পাচ্চি, তিনি,—বলতে ভাই বুক কেঁপে উঠে;—তাঁর যদি 'ভাল মন্দ' হয় তাহলে আমি আরো ভুগব;—আমার কষ্টের সীমা থাকবে না। ভুগতে আমি ভয় করি না ভাই! যতদিন আমার হাতের 'নোয়া' অক্ষয় থাকবে ততদিন আমি কষ্টকে সুখ মনে ক'রবো। ওঁকে যদি রেখে যেতে পারি তাহলেই মঙ্গল, তা নৈলে সব অন্ধকার, দেবরদের ব্যবহার তো সব জান ভাই! বে হ'য়ে এস্তক

সুখের মুখ আমি দেখি নাই! প্রথম বৎসরে একটু তাঁর আদর পেয়েছি। তার পর এক সর্ব্বনাশী রাক্ষসী এসে আমার সর্ব্বনাশ করেছে! গৃহস্থের বাড়ি কোড়ের্ঁাড়ি ঝি রাখা যে কত দোষ তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। যাক সে সব কথা। আমার বুকের ভিতর পাঁজার আগুন জ্বলছে। আমি হেন মেয়েমানুষ বলে সব সহ্য করছি! আর কেউ হ'লে বোধ হয় এতদিন কি করে ব'সতো! জন্মেছি হিন্দুর ঘরে উপায় ত নাই! এক একবার মনে করি বিষ খাব। আবার মনে হয় জ্বালা জুড়াবার জন্য জ্বালার সমুদ্রে ঝাঁপ দেব কেন! এ সংসারের কষ্ট এড়াতে গিয়ে চিরকাল নরকে পচব কি!—কিন্তু আর পারি না। স্বামী ভক্তি আর থাকে না, কিসে থাকবে!—একদিনের জন্য তাঁর একটা মিষ্টি কথা, একটু আদর পেলাম না, একটু মনের মতন সেবা করতে পারলাম না সেই রাক্ষসী সব কেড়ে নিয়েছে,—আমার সর্ব্বনাশ করেছে! মা ব'লে এসে বেরিয়ে গিয়ে সতীনের অধিক হ'য়েছে! এর চেয়ে যদি একটা সতীন থাকতো তাও ভাল ছিল। তা হ'লে জানতাম যে ওঁর কোন বিপদ নাই। এ রাক্ষসীদের নিশ্বাসে বিষ মাখান আছে;—উঁনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না।" স্নেহলতা বলিল, "বালাই! ও কি কথা! তোমার দেখছি বড় কষ্ট। তা কি ক'রবে ভাই, বাঙ্গালীর মেয়ে জন্মেছ সহিতে জন্মেছ। বাঙ্গালীর ঘরের বৌ স্বামীর ক্রীড়ার পুতুল, নিজের কোন অস্তিত্ব নাই।"

আবেগ সহকারে সরলা বলিল "ক্রীড়ার পুতুল হ'লেও যে ভাল ছিল। পুতুল নিয়েও তো এক একবার করে খেলা করে। আমার বরাতে যে তাও নাই!"

"মোটেই কি বাড়িতে আসেন না"

"আসেন শুধু একবার ভাত খেতে। সেই সময় সংসার খরচের

হিসাব দিতে হয়। বাপের বাড়িতে কখন হিসাব রাখিনি,—ভুল হয়। তুই একটী পয়সার গরমিল হ'লে চুরি করেছি মনে করেন। না ভাই, আর সহ্য হয় না! আমি কি আমার স্বামীর পয়সা চুরি করি! ওঃ! তিনি কি নিষ্ঠুর! না না, তাঁর দোষ কি! তিনি কি ক'রে জানবেন যে আমার মনে এত কষ্ট হয়। তিনি জানতে পারলে কখন ওমন কাজ করবেন না আমাকে কখন কষ্ট দিতেন না। তাঁর দয়ার শরীর। তাঁর কোন দোষ নাই। আমারই দোষ আমি কেন এক দিনও তাঁকে আমার মনের কথা বললুম না, বল্‌লে নিশ্চয়ই তাঁর দয়া হ'ত; তাহ'লে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে ভাল বাসতেন। 'ভগবান, নারীর সব মনের কথা স্বামীর কাছে গুছিয়ে খুলে বলবার শক্তি কেন দাওনি প্রভু!' যদি দিতে, তা হ'লে বোধ হয় আমাকে এত ভুগতে হতো না, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে দয়া ক'রতেন।"

স্নেহলতা বলিল "তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে ভালবাসবেন। সতী তুমি, সতী কখন চিরদিন স্বামী সুখে বঞ্চিতা থাকে না।"

এমন সময়ে ঝি আসিয়া বলিল, জানালার পার্শ্ব হইতে বাবু সব শুনিতেছেন। মনের কথা ফুরাইল, স্নেহলতাও কক্ষান্তরে যাইল। সুরেশ বাবু প্রবেশ করিয়া অধবদনে ক্ষণিক দণ্ডায়মান রহিলেন। সরলার প্রতি চাহিতে পারিলেন না। সরলা সজল নয়নে স্থির নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল। পরে সুরেশ বাবু আত্মগ্লানী ও অনুতাপ প্রযুক্ত কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "সরলা, আমায় মাপ কর। আমি তোমার যোগ্য স্বামী নহি। তুমি সতীরাণী আজ থেকে আমি তোমার উপাসক। আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা গ্রহণ কর। আমি মহা পাপী, আমার প্রতি প্রসন্না হও! আমি আর কখন তোমাকে ছেড়ে থাকব না;—আজ থেকে আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার। তুমি যাহা চাহিবে আমি তাহাই দিব—!

"আমি আর কিছুই চাই না 'তোমাকে' আমায় দাও বলিয়া সরলা সুরেশ বাবুর গলা জড়াইয়া ধরিল। সুরেশ বাবু সরলাকে চুম্বন করিলেন।

চক্রভেদ।

(পূর্ব্বসংখ্যার ৩১ পৃষ্ঠার পর)

পার্ব্বতীকে বিদায় দিয়া আগন্তুক ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। ছুটি পাইলাম, কোথায় একটু বিশ্রাম করিব,—না, এই এক গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত। এই নোট জালের রহস্য বড় সহজ বোধ হইতেছে না, রাও সাহেবও কম লোক নয়। মেয়েটির অদৃষ্টে অনেক নিগ্রহ আছে, দেখিতেছি। যাহা হউক, আমার উপর যখন ইহার অনুসন্ধানের ভার পড়িয়াছে, তখন আমাকে উপায় করিতে হইতেছে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আগন্তুক গ্রাম্য ডাকঘরে উপস্থিত হইল। রাজাপুর একটি গণ্ডগ্রাম, এখানকার ডাকঘরের সহিত সংলগ্ন একটি টেলিগ্রাফ অফিসও ছিল! আগন্তুক এই টেলিগ্রাফ অফিসে আসিয়া পুণা পুলিসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীকে একখানি টেলিগ্রাম করিলেন। টেলিগ্রামখানির মর্ম্ম এইরূপ,—"এখানকার বালাজী সাপ্রে জালনোট চালাইবার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছে। আমি যাহাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি, জেলের কর্ত্তৃপক্ষকে আপনি তারযোগে এইরূপ আদেশ প্রদান করুন।"—কাশীনাথ পন্থ।"

পাঠক, এতক্ষণে অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন, আগন্তুক অপর কেহই নহেন, মধ্যপ্রদেশের সুবিখ্যাত গোয়েন্দা কাশীনাথ পন্থ। তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ গোয়েন্দা, মধ্যপ্রদেশে কেন, সমগ্র দক্ষিণ ভারতবর্ষে কেহই ছিল না। বড় বড় জটিল মোকর্দ্দমার ভার গ্রহণ করিয়া ইনি অবলীলাক্রমে তাহার রহস্যচ্ছেদ করিতেন। এইজন্য কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার যেমন সমাদার করিতেন, তেমনই সম্মান করিতেন। অপর গোয়েন্দারা যে সকল মোকর্দ্দমায় কিছুই করিতে পারিতেন না, সেই সকল মোকর্দ্দমার রহস্যভেদ করিবার ভার কাশীনাথের উপরেই অর্পিত হইত।

ছদ্মবেশধারণে এবং অপরের স্বরানুকরণে তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন পাঠক এই আখ্যায়িকায় তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

কাশীনাথ টেলিগ্রামখানি প্রেরণ করিয়া একটু চিন্তিত হইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, কাহারও কৌতূহলের উদ্রেক না করিয়া কেবল কথাপ্রসঙ্গে অল্পকালের মধ্যে তিনি বালাজীর সম্বন্ধে সকল সংবাদই সংগ্রহ করিলেন।

জাল নোটের প্রচলন-সংক্রান্ত সকল সংবাদই যে তিনি সংগৃহীত করিতে পারিবেন, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। তবে বালাজীর প্রতি আরোপিত এই অপরাধের সম্বন্ধে গ্রাম্যলোকের শত্রু মিত্র উভয় পক্ষেরই মনোভাব কিরূপ, তাহা তাঁহার অবিদিত রহিল না। সাধরণ' ভাবে বালাজীর চরিত্র-সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা জানিতে পারিলেন।

একটী বিষয় দেখিয়া তিনি সবিশেষ বিস্মিত হইলেন। জাল নোটের ব্যাপারে গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে বালাজীর চরিত্রে নিন্দনীয় কিছুই ছিল না; অথচ আপাততঃ কাশীনাথ গ্রামের মধ্যে এমন একজন লোককে দেখিলেন না, যে বালাজীকে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস না করিয়াছে। কেহই এমন কথা বলিল না যে, ভ্রমক্রমে বালাজী গ্রেপ্তার হইয়াছে। বালাজী যে প্রকৃত পক্ষে অপরাধী, সকলেই অসঙ্কোচচিত্তে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে। কিন্তু গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকলেই তাহাতে সচ্চরিত্র বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং তাহাকে ভালও বাসিত।

এইরূপে তিন ঘণ্টা অতীত হইলে কাশীনাথ স্থির করিলেন, এতক্ষণে বোধ হয় তাঁহার টেলিগ্রামের উত্তর আসিয়াছে। তখন তিনি টেলিগ্রাফ অফিসে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় আসিয়া দেখি-

লেন, যথার্থই তাঁহার নামে টেলিগ্রাম আছে। টেলিগ্রামে লিখিত ছিল, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই ব্যাপারের তদন্ত-ভার গ্রহণ করুন। অপরাধীকে ধরিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। আপনি এই মকদ্দমার ভার গ্রহণ করিলে আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হইব। এ বিষয়ে আমি আপনার সাহায্য করিবার জন্য ত্রুটি করিব না। বন্দীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতিপত্র পরে পাইবেন।"

কাশীনাথ তার-বিভাগের কর্ম্মচারীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার নামে অপর কোন টেলিগ্রাম আছে কি না ?"

"একটি সংবাদ আসিতেছে, মহাশয় !"

কাশীনাথ কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়াই পূর্ব্বোক্ত অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইলেন। টেলিগ্রাফ অফিস হইতে পান্থশালায় আগমন করিয়া কাশীনাথ প্রথমে ভৃত্যকে তাঁহার অশ্ব সাজাইবার জন্য আদেশ দিলেন। পরে আহারাদি করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশীনাথ কারাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলে কারাধ্যক্ষ তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিলেন, বোধ হইল তিনি যেন গোয়েন্দার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বাস্তবিক তিনি পুনা-পুলিশের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কাশীনাথের সম্ভাবিত আগমন-সংবাদ পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কাশীনাথকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। কারাধ্যক্ষকে অনুমতি-পত্র প্রদর্শন করিবা মাত্র তিনি কাশীনাথকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন' "আপনার মত একজন সুবিখ্যাত গোয়েন্দার সহিত আলাপ করিয়া আমি গৌরবান্বিত হইয়াছি। বড় সাহেব আমাকে আদেশ দিয়াছেন যে, আপনার যাহাতে সর্ব্ব-প্রকারে সুবিধা হয়, আমাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আপনার যাহা কিছু প্রয়োজন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিবেন।"

কারাধ্যক্ষ একটি বাতি লইয়া কয়েদীদিগের কক্ষাভিমুখে চলিলেন; কাশীনাথও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কারাধ্যক্ষ বালাজীকে বলিলেন, "একটি লোক তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আসিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি বাতিটি গৃহমধ্যে রাখিয়া কাশীনাথকে গৃহে প্রবেশ করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

বালাজী এতক্ষণ তাহার কম্বল-শয্যায় শয়ন করিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। দ্বারোন্মোচনের শব্দ পাইয়া সে উঠিয়া বসিয়াছিল। কাশীনাথ কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন বালাজীও কোন কথা কহিল না।

অবশেষে কাশীনাথ বলিলেন, "বালাজী, তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে তোমার কি কিছুই বলিবার নাই?" বালাজী বলিলেন, "আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা আমি দশ জনকে দশবার বলিয়াছি। আর কি বলিব? আমি কোন অপরাধ করি নাই। কিন্তু নিরপরাধ হইলেও আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা যাহাকে তাহাকে বলা নিরাপদ মনে করি না। আপনি কে বলুন, কেন আমাকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছেন, তাহাও বলুন। তার পর আপনাকে সকল কথা বলা যায় কি না, তাহা আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব। বিবেচনার পর আমি যাহা জানি এবং যাহা সন্দেহ করি তাহা হয় আপনাকে এখনই বলিব, না হয় অপর কোন উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ করিব।"

বালাজী রাওসাহেবের মত রূপবান্ অথবা সুশ্রী না হইলেও তাহার আকৃতিতে এমন একটু সরলতা ও মহত্তব্যঞ্জক ভাব ছিল যে,

কাশীনাথের হৃদয় স্বতঃই এই বিপন্ন যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কাশীনাথ যুবকের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আমিকে, আর কেন তোমাকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহাই তুমি জানিতে চাও? তবে শুন। আমি একজন গোয়েন্দা, পুলিশের বড় সাহেব আমাকে এই মকর্দ্দমার তদন্ত করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। তুমি বলিতেছ, তুমি নির্দ্দোষ; তুমি যদি নির্দ্দোষ হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অপর কেহ অপরাধী। আমি সেই অপরাধীকেই গ্রেপ্তার করিতে চাই।"

বালাজী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। পরে বলিল, "আপনার ন্যায় শক্তিশালী লোক আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে আমার সমূহ ক্ষতি তাহা বুঝিতেছি; তথাপি আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আমার সন্দেহের কথা অপর কাহাকেও বলা উচিত নহে; যদি আমার পক্ষ-সমর্থনার্থ ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তাঁহাকেই সকল কথা বলিব।"

"কি করি, তাহা হইলে আসল কথাই বলিতে হয়"—কাশীনাথ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমি তোমার সাহায্য করিব বলিয়া পার্ব্বতীর কাছে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সুতরাং আমায় বিশ্বাস করিলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না।"

"পার্ব্বতীর কাছে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন!"

"হাঁ, পার্ব্বতী যখন বলবন্তের সহিত কথা কহিতেছিল, তখন হঠাৎ তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। বলবন্ত যখন বলপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, তখন আমি তাহাকে ঘুসি মারিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

পার্ব্বতী বলবন্তের সঙ্গে দেখা করিতে গেল কেন?"

"বলবন্ত পার্ব্বতীকে চিঠি লিখিয়াছিল যে, সে তাহার সাহায্য

করিতে পারে। সেই ভরসায় পার্ব্বতী বলবন্তের সহিত দেখা করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।"

"কিন্তু তাহা হইলেও গত শীতকালের কথা তাহার মনে করা উচিত ছিল।"

"সে তাহার বক্ষে ছোরা লুকাইয়া আনিয়াছিল। সে যাহাই হউক, আমি তাহাকে বলিয়াছি, রাও সাহেবের নিকট হইতে কিছুই আশা করিতে ভরসা নাই। সেও আর এরূপ অতিসাহসের কাজ করিবে না।"

বালাজী নিজ হৃদয়ের চিন্তাসূত্রের অনুসরণ করিয়া বলিল, "তা ছাড়া রাও সাহেব যে, সকল রকম দুষ্কর্ম্মই করিতে পারে, তাহা আমি যেমন জানি, পার্ব্বতীও কি তেমন জানে না?" এই কথাগুলি বলিয়াই বালাজী চমকিয়া উঠিল। সে বুঝিল, যে কথা গোপন রাখিবার জন্য সে এতক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিতেছে, তাহাই সে হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। এইজন্য সে একটু দুঃখিত হইল।

কাশীনাথ বলিলেন, "এখনও কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে পার নাই?"

"ইচ্ছা করে, কিন্তু সাহস হয় না।"

বালাজী যেরূপ দৃঢ়ভাবে কাশীনাথের অনুরোধ উপেক্ষা করিতেছে, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে অস্বীকৃত হইতেছে, তাহাতে অপর কেহ হইলে এতক্ষণ বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু মানবচরিত্রজ্ঞ কাশীনাথ বালাজীর ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাহার প্রতি বিরক্ত হইবারও তাঁহার অবসর রহিল না। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "বোধ হয় তুমি মনে করিতেছ, তোমাকে রক্ষা করিবার মত ক্ষমতা আমার নাই?"

বালাজী কোন উত্তর দিল না। কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অনুমানই সত্য। তখন তিনি পুণার

পুলিশের বড় সাহেবের টেলিগ্রামখানি তাহাকে পাঠ করিবার নিমিত্ত দান করিলেন। পাঠ শেষ হইলে কাশীনাথ বলিলেন, "এখনও কি তোমার বোধ হয় যে, আমার কিছুই ক্ষমতা নাই?"

বালাজী বিষণ্ণভাবে বলিল, "তাহা জানি না, মহাশয়। সে যাহাই হউক আমার সন্দেহের কথা আমি আপনাকে বলিতেছি। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। বলবন্ত রাও"—

"মহাশয়, একটা কথা আছে"—এই বলিয়া কারাধ্যক্ষ মহাশয় কাশীনাথকে ডাকিলেন। কাশীনাথ গৃহের বহির্ভাগে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলে কারাধ্যক্ষ বাতিটি লইয়া বারান্দায় আসিয়া দ্বারে চাবী বন্ধ করিলেন! কাশীনাথ অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন। দ্বার রোধ করিয়া কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "বড়ই দুঃখিত হইতেছি, ইহার মধ্যেই আপনাদের কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিতে হইল, কিন্তু উপায় নাই, আমি এইমাত্র বড় সাহেবের নিকট হইতে এইরূপ আদেশ পাইয়াছি। আপনার নামেও একখানি টেলিগ্রাম আছে।" এই বলিয়া কারাধ্যক্ষ একখানি টেলিগ্রাম কাশীনাথের হস্তে অর্পণ করিলেন। টেলিগ্রামে লিখিত ছিল,—"আপনাকে এই জাল নোটের মোকর্দ্দমার আর কোন তদন্তই করিতে হইবে না। বালাজী সাপ্রের সহিতও কোন কথাবার্ত্তা কহিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই শেষ আদেশ জানিবেন।"

কাশীনাথের বিস্ময় ও ক্রোধের সীমা রহিল না। কিন্তু তিনি ক্রোধ দমন করিয়া সহাস্যমুখে কারাধ্যক্ষকে বলিলেন, "বড় সাহেব বেশ বিচক্ষণ লোক, সময়ে টেলিগ্রাম করায় আমাকে আর বেশী পরিশ্রম করিতে হইল না।"

এইবার কারাধ্যক্ষের বিস্ময়ের পালা। তিনি বলিলেন, "আপনি তাহা হইলে বুঝিতে পারিয়াছেন?"

"নিশ্চয়। আপনাকে তিনি কোন কথা ভাঙ্গিয়া বলেন নাই ?"

"না। আপনার টেলিগ্রামে লিখিয়াছেন।—আচ্ছা আপনিই পড়িয়া দেখুন না।"

এই টেলিগ্রামখানি পাঠ করা কাশীনাথের উদ্দেশ্য ; তিনি কারাধ্যক্ষের টেলিগ্রামখানি পাঠ করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল— "পত্রপাঠমাত্র কাশীনাথ ও বালাজীর কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দাও। জরুরি"

কাশীনাথ পুনরায় ঈষৎ হাস্যে বলিলেন, "বড় সাহেবের সঙ্গে আমার এইরূপই বন্দোবস্ত ছিল।" কিন্তু তিনি পুণার পুলিশের বড় সাহেবকে সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিলেন, "ব্যাপার ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। সমস্ত বোম্বাইয়ের পুলিশের বিরুদ্ধে কাজ করিতে হইলেও আমি রহস্য ভেদ করিবই।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কাশীনাথ সুদক্ষ গোয়েন্দা। তিনি অন্তরঙ্গ ভাবের বাহ্যবিকাশদমনে সমর্থ ; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সাধারণ মানব-প্রকৃতি বর্জ্জিত ছিলেন না। পুলিশের বড় সাহেবের আচরণে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কারাগার হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই পুলিশ সাহেব তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য করেন নাই, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে এই জালনোট-ঘটিত ব্যাপারের সমস্ত রহস্য জানিবার জন্য তাঁহার মনে যথেষ্ট কৌতূহলও জন্মিল। ব্যাপারটা গুরুতর রহস্য-জড়িত বোধ হওয়াতেই পার্ব্বতী ও বালাজীর সাহায্য করিবার স্পৃহাও তাঁহার বলবতী হইয়া উঠিল।

কাশীনাথ ইহাও বুঝিলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে, রহস্য ভেদ করিতে পারিলেও তাঁহাদের প্রতিশ্রুত পুরস্কারের একটি পয়সাও পাওয়া যাইবে না, তথাপি তাঁহার উৎসাহ প্রশমিত হইল না, তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না ; বরং পুলিশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ প্রতিপদে তাঁহাদের নিকট হইতে বাধা পাইতে হইবে বলিয়া তাঁহার উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তিনি চতুরের সহিত চতুরালী করিতে ইচ্ছা করিলেন।

কারাগার হইতে বাহির হইবার পর কাশীনাথ গ্রামাভিমুখে যাত্রা না করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে গমন করিলেন। তথা হইতে অবিলম্বে পুনায় যাইয়া একেবারে প্রধান পুলিশ অফিসে উপস্থিত হইলেন।

কাশীনাথ বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে প্রহরী বলিল, "বড় সাহেব অফিসে উপস্থিত নাই।"

কাশীনাথ ঈষৎ হাসিয়া একখণ্ড কাগজে কয়েকটি কথা লিখিয়া প্রহরীর হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "এইটি বড় সাহেবকে দিয়া আইস।"

প্রহরী কাগজখানি হাতে করিয়া লইল বটে, কিন্তু একপদও অগ্রসর হইল না। পরন্তু উদ্ধতভাবে প্রত্যুত্তর করিল, "এইমাত্র আপনাকে বলিলাম, বড় সাহেব এখানে নাই।" প্রহরী আর তাঁহার সহিত অনর্থক বাক্যব্যয় করিতে প্রস্তুত নহে।

কাশীনাথ তখন মধুরকণ্ঠে বলিলেন, "বড় সাহেবের টেবিলের উপর রাখিয়া আসিতেও পারিবে না কি ?"

প্রহরী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল দেখিয়া কাশীনাথ পুনরায় বলিলেন, বড় সাহেবের সহিত আমাকে সাক্ষাৎ করিতে দিবে না, ইহাই তোমার প্রতি আদেশ আছে। কিন্তু আমি কোন চিঠি দিলে তুমি তাহা লইয়া যাইবে না, এরূপ কোন আদেশ তোমাকে দেওয়া হয় নাই ত ?"

প্রহরী আরও একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আচ্ছা আমি এই কাগজখানি বড় সাহেবের টেবিলের উপর রাখিয়া আসিতেছি, আপনি কাল সকালে ইহার জবাব পাইবেন।"

"বেশ।" কাশীনাথ কিন্তু সেখান হইতে নড়িলেন না, তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। একটু পরে প্রহরী হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইল। তৎপরে নিতান্ত অনুগত জনের ন্যায় নরম হইয়া বলিল, "আমি ভুল করিয়াছিলাম, বড় সাহেব আছেন, তিনি আপনাকে ডাকিতেছেন।"

কাশীনাথ হাসিয়া প্রহরীর সঙ্গে সঙ্গে অফিসের ভিতর গমন করিলেন। বড় সাহেব তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "ঐ বোকা লোকটি আপনাকে আসিতে দেয় নাই। আপনি কিছু মনে করিবেন না। আবার যাহাতে এরূপ না হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। এখন সংবাদ কি ? তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন ত ?"

"বলেন কি ? আপনার টেলিগ্রাম পাইবার পর ?"

"কেন, আমার টেলিগ্রামে কি কোন গোলমাল ছিল ?"

"আপনি কোন্ টেলিগ্রামের কথা বলিতেছেন ?"

"যে টেলিগ্রাম আমি আপনাকে পাঠাইয়াছি ?"

"কখন পাঠাইয়াছেন ?"

"আজ সন্ধ্যার সময়। আজ আপনার কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, সেখানা তবে কি ?"

"আজ সন্ধ্যার সময়। আজ সন্ধ্যার সময় ত আমি আপনাকে কোন টেলিগ্রাম পাঠাই নাই।"

কাশীনাথ কারাগারে যে টেলিগ্রামখানি পাইয়াছিলেন, সেখানি

পুলিশের বড় সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে উহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "ইহার অর্থ কি? আমি ত এরূপ কোন টেলিগ্রাম পাঠাই নাই।"

"বালাজীর সঙ্গে আমার কথা কহিতে নিষেধ করিয়াও কি আপনি কারাধ্যক্ষকে অপর একখানি টেলিগ্রাম পাঠান নাই!"

"না তাঁহাকেও না। তাঁহাকে একখানিমাত্র টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলাম। উহাতে তাঁহাকে সাক্ষাতের সকল প্রকার সুযোগ করিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। আর আপনি বলিতেছেন, আপনি এই টেলিগ্রামখানি পাইয়াছেন, কারাধ্যক্ষও আর একখানি টেলিগ্রাম পাইয়াছেন!"

"আপনি অবশ্য আসামীর সহিত কোন কথাই কহিতে পান নাই।"

"তা" ঠিক নয়। আমি তাহার সহিত কয়েকটি কথা কহিয়াছিলাম তবে কথার মাঝে বাধা পড়িয়া যায়। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, জালিয়াতদিগের কোন বন্ধু এই টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিল। সে যাহা হউক, একটু তদন্ত করিলেই এই বন্ধুটিকে বাহির করিতে পারা যাইবে। তাহা হইলে খোদ জালিয়াতদিগকেও ধরা কঠিন হইবে না।"

"হাঁ, এটা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে বটে। তা' থাক; আমিই তদন্ত করিয়া দেখিতেছি। এটা আমারই করা উচিত। আমার নাম পর্য্যন্ত জাল করিয়াছে, ইহাদের সাহস ত কম নয়!"

কাশীনাথ বলিলেন, "আমার তদন্ত শেষ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। আপনি আমাকে যে তদন্তের ভার দিয়াছেন, এটিও তাহারই অংশ বৈত নয়।"

"না না, থাক থাক, এ ব্যাপারটার তদন্ত আমি নিজেই করিব। ইতিমধ্যে মুল মোকর্দ্দমার আমি একটি প্রয়োজনীয় সূত্র

পাইয়াছি। আপনি সেই সূত্র ধরিয়া তদন্ত করিলে শীঘ্রই কৃতকার্য্য হইবেন।"

"কি সূত্র পাইয়াছেন ?"

"সুরাটে একজন জালিয়াতের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন। আপনি যত শীঘ্র পারেন, সুরাটে রাত্রা করুন। আমি আপনাকে সমস্ত বিবরণ দিতেছি। সেই লোকটীকে ধরিতে পারিলেই দলের সকলেই আমাদের মুটার মধ্যে আসিয়া পড়িবে।"

"আপনার যাহা অভিরুচি ; ষ্টিমার কখন ছাড়িবে ?"

"পরশু সন্ধ্যার সময়।"

"তাহা হইলে ইহার মধ্যে আমি রাজাপুরে গিয়া বালাজীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করিতে পারিব।"

"নিশ্চয়ই। আপনি না এইমাত্র বলিলেন যে, তাহার সঙ্গে কিছু কিছু কথা হইয়াছে ? কি কি কথা হইয়াছে ?"

"কথাবার্ত্তার মাঝে যখন বাধা পড়িয়া গিয়াছে, তখন আমি অর্দ্ধেক কথা আপনাকে বলিব না। আপনি যদি আমাকে দেখা করিবার জন্য অনুমতি দিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া দেন, তাহা হইলে আমি এখনই যাত্রা করিতে পারি।"

"ঠিক বলিয়াছেন।" এই বলিয়া বড় সাহেব একখানি চিঠি লিখিয়া দিলেন।

কাশীনাথ ধন্যবাদ করিয়া পত্রখানি গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "আমি ফিরিয়া আসিয়া আপনাকে সমস্ত সংবাদ প্রদান করিব। তাহার পর সুরাটে যাত্রা করিব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কাশীনাথ পুলিশ সাহেবের চিঠি লইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই রাজাপুরে যাত্রা করিলেন। রাজাপুরে পৌঁছিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল; কিন্তু বড় সাহেবের আদেশপত্র থাকাতে কাশীনাথ কারাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎলাভে বঞ্চিত হইলেন না।

বাস্তবিক তিনি কারাগারে গমন করিলেই প্রহরী তাঁহাকে নিদ্রালু কারাধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত করিল। কারাধ্যক্ষ তাঁহাকে দেখিয়া হাই তুলিতে তুলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মহাশয় এই রাত্রিতে আবার যে ?"

"বন্দী বালাজীর সহিত আবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছি। পুলিশ সাহেব লিখিত আদেশ দিয়াছেন. এই নিন।"

কিন্তু কারাধ্যক্ষ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বড় সাহেব কি জানেন না যে"—বলিতে বলিতে কারাধ্যক্ষ থামিয়া গেলেন।

"কি জানেন না ?"

"বন্দীকে অন্যত্র পাঠান হইয়াছে ?"

"অন্যত্র পাঠান হইয়াছে কখন্ ? কোথায় ?"

"আপনি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পর একঘণ্টাও অতীত হয় নাই, এমন সময়ে চৌকিদার পুলিশের ইনস্পেক্টর-জেনারেলের নিকট হইতে আদেশপত্র লইয়া আসে। তাহাতেই বন্দীকে স্থানান্তরে প্রেরণের কথা ছিল।"

"কোথায় লইয়া যাওয়া হইল ?"

"তাহা বলিতে পারি না।"

"আদেশপত্রে কোন উল্লেখ ছিল না, সাধারণতঃ স্থানান্তরিত করিবার আদেশপত্রে স্থানের নামোল্লেখ করা হয় ত ?"

"তাহা আমি জানি, কিন্তু এই আদেশপত্রে স্থানের নাম লিখিত ছিল না।"

"তবে আমি চলিলাম।"

কাশীনাথ অতি ব্যস্তভাবে কারাগৃহ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বাহিরে আসিবার পর তাঁহার আর সে ব্যস্তভাব দেখা গেল না। তিনি ধীরে ধীরে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশন তখন প্রায় জনশূন্য, আলোকেরও একান্ত অভাব। একজন মাত্র প্রহরী প্ল্যাটফরমের পাহারায় নিযুক্ত ছিল।

কাশীনাথ তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুণার ট্রেণ কখন্ ছাড়িবে?"

প্রহরীর মেজাজ ভাল ছিল না। সম্ভবতঃ তাহাকে অনেকবার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছে। সে বিরক্তি-মিশ্রিত কর্কশস্বরে বলিল, "দুইটার সময়ে।"

কাশীনাথ প্রহরীর বিরক্তির কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি লোকচরিত্র-বিশ্লেষণে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রহরীর মেজাজ ঠাণ্ডা করিয়া তাহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে কিছু মাত্র কঠিন হইল না।

প্রহরী প্লাটফরমের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পদচারণা করিতেছিল। কাশীনাথ তাহার পার্শ্বে থাকিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে পদচারণা করিতে করিতে, অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "দেখ্‌তে পাচ্ছ, আমি একজন গোয়েন্দা, জালনোটের মোকর্দ্দমার তদন্ত কর্‌বার জন্য এসেছি। যে প্রহরী বন্দীকে নিয়ে গেছে, তার সঙ্গে এইখানে আমার দেখা কর্‌বার কথা ছিল।"

প্রহরী তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কোন কয়েদী, বালাজী সাপ্রে? পুলিশের লোকেরা কি তাকেই নিয়ে গেছে?"

"হাঁ, তাকেই। তারা কি আমার অনেক আগে এখানে এসেছিল ?"

"তারা এগারটার ট্রেণে পুণায় চলে গেছে !" (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

কবি।

(শ্রীযুত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারি লিখিত)

পূর্ব্ব গগনে রক্ত বরণে
যখন তপন উদে গো,
মুগ্ধ নয়নে নিত্য রহে সে
কানন তলেতে ব'সে গো।
শুভ্র চাঁদিমা দীপ্ত তারকা
ভাসিলে উদার বিমানে,
মত্ত তাহার মুক্ত পরাণ
কোথায় ছুটে যে কে জানে।
অভ্র-বিদারী অদ্রি-ভবনে
রহিতে তাহার বাসনা,
সিন্ধু-সলিলে সিন্ধ সাধক
ডুবায় ভাবনা যাতনা।
কুঞ্জ-কাননে মন্দ সমীরে
সরস কুসুম ফুটিলে,
পক্ষী কূজনে স্তব্ধ সে যে গো
সাড়াটী দিবে না ডাকিলে।

তপ্ত প্রাণের মর্ম্ম যাতনা
সহিতে সে যে গো পারেনা,
অশ্রু মুছা'তে অশ্রু ফেলে সে
আরত কিছুই জানে না।
বিশ্ব মাঝারে হাস্য দেখিলে
পুলকে সে উঠে হাসিয়া,
চিন্তা জগতে রাজ্য পাতিয়া
সে রহে কোথায় বসিয়া।
পুণ্য জানেনা, ধর্ম্ম জানেনা
সে জানে শুধু গো সাধনা,
শক্তি লভিয়া শান্ত কবি সে
তাহার আছে কি তুলনা।

হেঁয়ালি।

৩। আগে যায় ফিরে চায় উনি তোমার কে
মোর শ্বশুরকে ওর শ্বশুর শ্বশুর বোলেচে
৪। আগে যায় ফিরে চায় উনি তোমার কে
মোর বাপকে ওর বাপ শ্বশুর বলেচে।

শ্রীমতী ঊষা বালা—

(তৃতীয় সংখ্যায় উত্তর থাকিবে।)

দ্বিতীয় সংখ্যার হেঁয়ালির উত্তর।

(১) শঙ্খ। (২) ভরত।

---

২৬ খানি সংবাদপত্রে ও বহু মনিষীগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

উপন্যাস রাজ্যে যুগান্তর।

শবাসনা।—মরণাহত স্বামীসহ জ্বলন্তচিতারোহণের চিত্র এরূপ প্রকটিত যে পাঠে লোমাঞ্চ হইবে। আকার বৃহৎ মূল্য ১৲।

দিগবসনা।—স্বামী কর্ত্তৃক ত্যক্ত যোগপ্রভাবে স্বামীর উদ্ধার ইত্যাদি পাঠে মোহিত হইবেন মূল্য ॥০।

চরিত্র রত্নাবলী।—সমাজ ধর্ম্মনীতি বিষয়ক নূতন ধরণের ঐতিহাসিক উপন্যাস আকার বৃহৎ প্রায় ৩৫০ পৃঃ বাঁধা ১৲ প্রণেতা কেদারনাথ বিদ্যাবিনোদ।

দুষ্প্রাপ্য অমূল্য গ্রন্থরাজী সুলভে বিতরণ।

১। **যোগসাধন।**—জনৈক ব্রহ্মচারী কৃত অবলাকান্ত সেন সংগৃহীত মূল্য বাঁধা ২৲ আবাঁধা ১॥০। যোগসাধন কি? কি উপায়ে গৃহী যোগী হইতে পারে ইত্যাদি বহু বিষয় এবং যৌগিক তথ্যে পূর্ণ অদ্বিতীয় যোগগ্রন্থ।

২। **ব্রহ্মচর্য্য সাধন।**—ঐ কৃত ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ না হইলে মূল্য ফেরৎ দিব। আকার ৪৫০ পৃঃ বাঁধা ২।০, আবাঁধা ২৲।

৩। **প্রাচীন অযোধ্যা।**—ত্রেতাবতারে রামচন্দ্রের রাজত্ব-কালীন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও ভূগোল একত্রে ম্যাপ দ্বারা বিশেষ বর্ণিত, বোধ হয় যেন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখান হইতেছে, আর রামায়ণ কিনিতে হইবে না। রয়েল ৮ পেজী ২৫০ পৃঃ মূল্য রাজ সংস্করণ ২॥০, সাধারণ ১।০ ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ সাহিত্য কর্ণধার বলেন "নূতন ধরণের বঙ্গ সাহিত্যের রত্ন বিশেষ।

বহুল ব্যয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্ধার।

প্রণেতা শ্রীরামগোপাল রায় জ্যোতির্ব্বিনোদ জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধ।

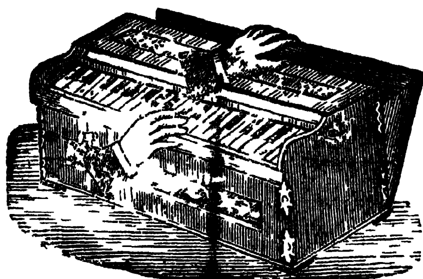
১। ভাব কুতুহল মূল্য ১॥০। ২। লঘু পরাশরী বা উড়ুদার প্রদীপ ১।০, ৩। জাতকালঙ্কার ৸৵০, ৪। জ্যোতিষ প্রভাকর ৩৲, ৫। কেবল সামুদ্রিক ১॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—ভারতী লাইব্রেরী।

৬৯, হ্যারিসন রোড পোষ্ট, কলিকাতা।

Nightingale Flute.

Single slide From Rs 17 to 30.



Double Slide From Rs. 30 to 100.

'Where Nature fails Art steps in.'

A rare way of hearing sweet sonorous notes of the sweet tunes the world is replete with at a time. Have you heard the jocund dins of nightingale, Canery, Cucoo and the oriental sweet bicks sitting in a room ? The answer, I Can say, must be in the negative. We have made our flutes ready to treat you with the mirthful pleasure of hearing what is stated above and make you answer him who will ask as above "Yes I always hear since I bought a Nightingale Flute, and I insist upon a man of taste and Sense to buy one "**Nightingale Flute.**"

Agents Wanted. Apply to the proprietors—

A Pandit & Sons.

19, Goabagan Street.

Sitalatala, Goabagan, Calcutta.

অভিনয় প্রণালী ও অথার সম্বন্ধে মতামত।

"এখানে দুই খানি পুস্তকের একত্র সমাবেশ ; অভিনয়-প্রণালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের শিক্ষার জন্য,—সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। যাহাদের জন্য লিখিত হইয়াছে তাহাদের উপকারে আসিলে পুস্তকের সফলতা হইবে। দ্বিতীয় পুস্তকখানি 'অথার' এখানাও একখানি প্রহসন। 'অথার, সমালোচক ম্যানেজার, ডাইরেক্টর সকলের প্রতি ইহাতে, বেশ কটাক্ষ আছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া সমধিক প্রীত হইলাম।"—সমাজ।

"বাঙ্গালার রঙ্গালয় মাত্রেই যে অল্পাধিক দোষ আছে তাহা কে অস্বীকার করিবে ? ঐ সকল দোষ গ্রন্থকার অভিনেতা অভিনেত্রীগণের সম্মুখে ধরিয়া ভালই করিয়াছেন। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ ঐ সকল কথা শুনিবেন কি ?"—নায়ক।

"নাটকাভিনয় শিক্ষার অনেক কথাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় অভিনেতা অভিনেত্রীর দোষগুণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, এ পুস্তকেই তাহার পরিচয়। সুতরাং অভিনয় সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ সমূহ অনেকের পড়িবার ও ভাবিবার জিনিস। পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রীগণের তো কথাই নাই, সখের অভিনেতা অভিনেত্রীগণও ইহাতে অনেক কাজের কথা পাইবেন। অথার একটী ছোট নক্সা।—বঙ্গবাসী।

"কিরূপ প্রণালীতে অভিনয় করিলে অভিনয় কার্য্য সুচারুরূপে সংসাধিত হয়, গ্রন্থকার 'অভিনয় প্রণালী ও অথার" গ্রন্থে তাহাই বিষদ ভাবে দেখাইয়াছেন। ইহা রঙ্গালয়ের অভিনেতা অভিনেত্রীগণের বিশেষ আদরের সামগ্রী।"—প্রতিবাসী

"The author seems to be an amateur actor, and in the book under notice (' Method of acting") he gives certain useful hints which would be actors cannot fail to profit by."—Indian Daily News.

১ম বর্ষ। আষাঢ়, ১৩২১। ৩য় সংখ্যা।

অঞ্জলি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী দত্ত।

খেখকগণের নাম—

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব, ৺রাজেন্দ্রনাথ নন্দী,
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সেন, শ্রীমতী উষাবালা (অমূল্য) ও সম্পাদক।

সূচী।

কার্য্যালয় ঃ—১৯ নং ঈশ্বর মিল লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীবিষ্ণুপদ দাস।

ডাক মাশুলসহ বার্ষিক
মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

এই সংখ্যার
মূল্য ⁄৹ আনা।

নিয়মাবলী।

১। "অঞ্জলি"র বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১২ সংখ্যা ডাকমাশুল সহ ১৲ একটাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যা ৴৹ আনা মাত্র ডাকযোগে বা লোক মারফতে "অঞ্জলি"র বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। "অঞ্জলি" প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ মধ্যে প্রকাশিত হয়। মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্ত হইলে উক্ত তারিখেই "অঞ্জলি"র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র দিলে তাহার তদন্ত ও প্রতিকার করা হয়।

৩। গ্রাহকগণ কোন পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৪। কেহ স্থান পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে এবং বিজ্ঞাপন দাতাগণ বিজ্ঞাপন বদল করিতে চাহিলে পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে তাহা আমাদিগকে জানাইবেন। নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৫। 'বেয়ারিং' বা 'ইন্‌সাফিসিয়েণ্ট', পত্রাদি গৃহীত হয় না। ষ্ট্যাম্প বা রিপ্লাই কার্ড ব্যতীত পত্রোত্তর দেওয়া যায় না। লোক পাঠাইলে লোক মারফতেও উত্তর দেওয়া যায়। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং চিঠিপত্র টাকা কড়ি বিনিময়ে সাময়িক পত্র ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

বিজ্ঞাপনের হার।

মলাটের ৪র্থ পৃষ্ঠা ৪৲ টাকা, মলাটের ৩য় পৃষ্ঠা ২৲ টাকা মলাটের ২য় পৃষ্ঠা ২৲ টাকা, সাধারণ প্রতি পৃষ্ঠা ১৷৹ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৸৹ আনা।

ম্যানেজার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দে।

১৯ নং ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান কলিকাতা।

অঞ্জলি —



কৰ্ম্মবীর বটকৃষ্ণ পাল।

১৮৩৩—১৯১৪।

অঞ্জলি।

১ম বর্ষ } আষাঢ়, ১৩২১ সাল { ৩য় সংখ্যা।

বৈজ্ঞানিক।

(১)

গিলবার্ট একজন বৈজ্ঞানিক। তাঁহার বয়স প্রায় ৩০ বৎসর! তাঁহার হৃদয়ে দয়া আছে, মায়া মমতা আছে, ভালবাসা আছে, কিন্তু এ সমস্ত প্রদান করিবার মতন ব্যক্তি তাঁহার নাই; সেইজন্য সদা সর্ব্বদা বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিভোর হইয়া থাকেন। তাঁহার আত্মীয় নাই তিনি একটি দরিদ্র কৃষকের একমাত্র সন্তান এবং শৈশব হইতে অনাথা, আপনার বিদ্যার ও বুদ্ধির বলে জার্ম্মানীর একটি Research Instituteএ অধ্যাপকের পদ লাভ করিয়াছেন।

তাঁহার বিশ্বাস তাঁহাকে কেহ ভালবাসে না এবং তাঁহারও ভালবাসিবার পাত্র অধুনা এজগতে নাই।

বহু বৎসর হইল তিনি স্বদেশ হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। নিজের বসতবাটীও বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—আছে কেবল একটি শেষ স্মৃতি, সেটি তিনি সর্ব্বদা নিজের নিকটে রাখিতেন।

গিলবার্টের অভিলাষ যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতি করিয়া কল্পনা রাজ্যকে দেশ হইতে দূরীভূত করিয়া মনুষ্যকে উন্নত করিবেন। যাহা দেখা যায়, শুনা যায় তাহাই বিশ্বাসযোগ্য, যাহা কল্পনা তাহা অলীক। অলীক বস্তুকে বিশ্বাস করিয়া, ছায়াবাজীতে গা ঢালিয়া দিয়া কেন মনুষ্য অজ্ঞান থাকিয়া বিজ্ঞানালোচনাসুখে বঞ্চিত থাকিবে।

তাঁহার বিশ্বাস, বিজ্ঞানের নিকট সাহিত্য স্থান পায় না ; এ বিশ্বাস তাঁহার পূর্ব্বে না থাকিলেও কিছুদিন হইতে হইয়াছে।

গিলবার্ট অদ্যাবধি অবিবাহিত। বন্ধুদিগের অনুরোধে জীবনটাকে একটু মধুময় করিবার জন্য দু'একবার প্রয়াসও পাইয়াছিলেন, কিন্তু মনোমত স্ত্রীর সন্ধান করিতে সমর্থ হন নাই। এইজন্য একদিন তাঁহার একটি বন্ধু উপহাস করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি এত বড় বৈজ্ঞানিক, না হয়, একটা যুবতীর জীবন বিশ্লেষণ (Analysis) করিয়া বিবাহ কর ?" ইহাতে গিলবার্ট একটি ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন "তাহাও করিয়াছিলাম।"

"তোমার জীবনই ভুল," "এই বলিয়া বন্ধুটি উপহাস করিয়াছিলেন।"

কবি না হইলেও গিলবার্ট জ্যোৎস্নারাত্রে কখন কখন নীলনভোমণ্ডলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চন্দ্রের সুধা উপভোগ করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ ঠাট্টাচ্ছলে বলিত, "অধ্যাপক মহাশয় চন্দ্রের জ্যোতি বিশ্লেষণে (analysis) প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কবি বন্ধুরা বলিতেন, "গিলবার্ট কঠোর নির্ম্মম বিজ্ঞান ছাড়িয়া কবিতাদেবীর আরাধনা করিতেছে।" গিলবার্ট শুনিয়া হাসিতেন কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিতেন না।

সকলে বলিত, "অধ্যাপক মহাশয়ের জীবন একটা প্রহেলিকা।"

একদিন তাঁহার একটি বন্ধু একটি সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোককে দেখিয়া তাহাকে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে গিলবার্টকে অনুরোধ করিলেন।

তাহার চেহারাটা সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায়, রং অস্তগামী সূর্য্যের লোহিতাভের মত, চক্ষুদুটি টানা, 'হাবভাবে' ধীর ও লজ্জাশীলা। হইলে কি হয় ; গিলবার্ট তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, "আলো-

কের বর্ণ-বিশ্লেষণ (Spectrum analysis) করিলে বুঝিতে পারিবে ঐ রং কিছুই নহে,—বৃষ্টির পরে রামধনুর ন্যায় অলীক। আর গঠন? উহার বিষয় আমি সম্প্রতি কিছু জানি না, কারণ ডাক্তারী শাস্ত্রে এখনও ব্যুৎপন্ন হই নাই, তবে শীঘ্রই ইহারও মীমাংসা করিয়া তোমায় বুঝাইতে সমর্থ হইব।"

সৌন্দর্য্যের ও গঠনের উপর এই প্রকার বক্তৃতা শুনিয়া বন্ধুটি হাসিয়া বলিলেন, "সকল বস্তুর সত্যতা অনুসন্ধান করিতে যাইলে ঈশ্বরকেও বিশ্বাস করা যায় না।"

"ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতেও তোমায় অনুরোধ করিতেছি না", গম্ভীর ভাবে এই কথা বলিয়া, গিলবার্ট আপনার কার্য্য করিতে লাগিলেন।

গিলবার্ট স্বয়ং একটি তত্ত্বপরীক্ষাগার (Research House) খুলিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে গিবার্টের নাম সহরে রাষ্ট্র হইয়া যাইল, কত বড়লোক তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল কিন্তু বৈজ্ঞানিক কাহারও সহিত না মিশিয়া সদা সর্ব্বদা আপনার কার্য্যে বিভোর হইয়া থাকিতেন। অকাতর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল, মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতার বিন্দুমাত্র চিহ্নও অন্তর্হিত হইল। সকলে বলিত "বেচারী বৈজ্ঞানিকটী এইবার অকালে প্রাণ হারাইবে, অথবা উন্মাদ হইয়া যাইবে।"

(২)

গ্রীষ্মকাল। আকাশে একটু মেঘ করিয়াছে। ঘরের ভিতর গিলবার্ট কি একটি প্রস্তরখণ্ড লইয়া তাহার উপর মনোনিবেশ করিয়া রহিয়াছেন। বাহিরের কোন শব্দই তাঁহার কর্ণগোচর হইতেছে না—বোধ হইতেছে যেন কোলাহলময়—জগত হইতে তিনি বহুদূরে বাস করিতেছেন। এমন সময় একটি শীর্ণ, দরিদ্র স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

সহসা তিনি ঘরে একটি মলিনা স্ত্রীলোকের অনধিকার প্রবেশ দেখিয়া একটু কুপিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি প্রয়োজন ?"

আপনিই কি "প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ?" এই বলিয়া স্ত্রীলোকটি আরও একটু নিকটে আসিল।

"হাঁ, আমি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক না হ'তে পারি কিন্তু অধ্যাপক যে এ বিষয় নিঃসন্দেহ।"

"আপনি কি দয়া করিয়া রুমালের এই স্থানের কাল রংটি বিজ্ঞানের সাহায্যে তুলিয়া দিতে পারেন ?" এই বলিয়া একখানি রুমাল ও একটি শিলিং তাঁহার হস্তে প্রদান করিল।

অধ্যাপকের মনটি তখন সেই প্রস্তরের উপর নিবিষ্ট ছিল। তিনি অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "পাঁচ শিলিং লাগিবে। এটি কাল রং নহে বোধ হয় কোনরূপ দুষিত তৈল পদার্থ।"

স্ত্রীলোকটি কাতরভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "মহাশয় আমি অতীব গরীব, সামান্য কুলির কার্য্য করি। আজ প্রায় তিন দিন একপ্রকার অনাহারে থাকিয়া এই শিলিংটি জমাইয়াছি। উপ-স্থিত আমার নিকট আর কিছু নাই, কিন্তু রুমালের এই অপরিষ্কার স্থানটিকে পরিষ্কার করিতে হইবে। যদি দয়া করিয়া তিন শিলিংএ করিয়া দেন তাহা হইলে আর দুই সপ্তাহ পরে আসিব।" এই বলিয়া দীনভাবে উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিল।

"আচ্ছা আসিও" এই বলিয়া বৈজ্ঞানিক স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

স্ত্রীলোকটি রুমালখানি অতি যত্ন সহকারে লইয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখীত হৃদয়ে ঘরের বাহিরে আসিল।

কি ভাবিয়া বৈজ্ঞানিক তাহাকে আবার ডাকিলেন। সে পুনরায় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

বৈজ্ঞানিক তাহার হস্ত হইতে রুমালখানি লইয়া রসায়নিক পদার্থের দ্বারা রংটিকে তুলিতে চেষ্টা করিলেন। স্ত্রীলোকটি একদৃষ্টে সতৃষ্ণ নয়নে সেই রুমালের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইহাতে বিফল মনোরথ হইয়া উত্তাপ দিবার নিমিত্ত বারনারের (Burner) উপর ধরিলেন। অগ্নির উপর ধরিতে দেখিয়া স্ত্রীলোক-টির মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া যাইল। সে বাধা দিতে যাইতেছে এমন সময় প্রায় সব শেষ—রুমালের অর্দ্ধেকটি অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাইল।

রমণী পাগলিনীর ন্যায় মর্ম্মবিদারক-স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "মহাশয় করিলেন কি? তাহার শেষ স্মৃতিটুক অগ্নিতে ভস্মীভূত করিবার জন্যই কি পয়সা দিয়া প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের সাহায্য লইয়া-ছিলাম?" তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, পদদ্বয় দেহভার বহনে একপ্রকার অসমর্থ হইতেছিল।

বৈজ্ঞানিকের এইবার চমক্ ভাঙ্গিল। তিনি একটি সামান্য রমণীর দ্বারা এই প্রকার তিরস্কৃত হইয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলি-লেন, "ইহার দাম কত?"

ইহার দাম কি আপনার মত বৈজ্ঞানিক বুঝিতে পারিবে! হায়, গিলবার্ট ডেলের শেষ স্মৃতিটুকু আপনি ভস্মীভূত করিলেন! হায় আমার কি হইল!" রমণীর চক্ষু অশ্রু পরিপ্লুত হইতেছিল সে আর থাকিতে না পারিয়া সামান্য বালিকার ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

বাহিরের আলোক কমিয়া আসিল। চাকর আসিয়া বৈদ্যুতিক আলো খুলিয়া দিল।

বৈজ্ঞানিক একটু হতবুদ্ধি ও স্তম্ভিত হইয়া নয়নদ্বয় বিস্তৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার স্মৃতি?"

"গিলবার্ট ডেলের। বাল্যে আমরা এক সঙ্গে খেলা করিতাম,

এক সঙ্গে থাকিতাম,—যেন একবৃন্তে দুটি ফুল! স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ সে আমায় এই রুমালটি দিয়া আমার নিকট বিদায় লইয়াছে,—ওঃ! সে কি ভয়ানক দিন! তাহার পর শুনিলাম সে জাহাজ ডুবি হইয়া মারা যায়—!' রমণীর কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

বৈজ্ঞানিক ক্ষণিক বজ্রাহতবৎ নিশ্চল থাকিয়া উন্মাদের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"রমণী!—কোথাকার গিলবার্ট?"

রমণী উত্তর করিল, "লিড্‌সের"।

"সে বোধ হয় কৃষকের সন্তান ছিল?"

"হাঁ"

"শৈশব হইতে অনাথ।"

হাঁ, আপনি কি তাহাকে চেনেন্? হায়, চিনিয়াও আমার সর্ব্বনাশ করিলেন! আপনি কি নিষ্ঠুর! আপনার রসায়নিক পদার্থ সকল কি নির্ম্মম!"

বিস্ময়ে ও উল্লাসে বৈজ্ঞানিকের হৃদয় তোলপাড় হইতে লাগিল। বিস্ফারিতনেত্রে পুনঃ পুনঃ রমণীকে দেখিতে লাগিলেন।

দুইজনেই নিস্তব্ধ। অল্পক্ষণ পরে একটু স্থির হইয়া বৈজ্ঞানিক বলিলেন, "তোমার নাম কি এ্যালিস্?"

"হাঁ। আপনি কি প্রকারে জানিলেন?" এই বলিয়া রমণী আরও বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিল।

"এ্যালিস্ আমি তোমার প্রেমিকের শেষ স্মৃতিটুকু পুড়াইয়া ফেলিয়াছি কিন্তু তাহাকে যদি আনিয়া দিতে পারি?"

পার্শ্বের ঘর হইতে চাকর তাহার প্রভুর এইরূপ বাক্যালাপ একটু আধটু শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিল,

"রমণীর নিকট কঠোর বিজ্ঞানও 'মোলায়েম' ভাব ধারণ করে।"

বৈজ্ঞানিকের কথা শুনিয়া রমণী যেন একবার কি ভাবিল তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিল, "হায় তাহা কল্পনাতীত—"

"এ্যালিস, আমিই সেই নিষ্ঠুর গিলবার্ট্ ডেল" এই বলিয়া সেই নিতান্ত গদ্যময় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, রমণীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। দুই জনের চক্ষু দিয়া অশ্রু ধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

পরে গিলবার্ট বলিল 'এ্যালিস ধন্য তোমাদের রমণী হৃদয়ের ভালবাসা, শৈশবের সামান্য স্মৃতিটুকু এখনও বিস্মৃত হও নাই। আমি নরাধম তাই তোমার মত রমণীকে ভুলিতে বসিয়াছিলাম। আজ তুমি আমার একটা স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে, আমি একটা নূতন জগৎ দেখছি। কখন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি নাই এখন বুঝেছি তিনি আছেন, তাই আমার বাল্য সঙ্গি ফিরে পেলাম।"

পার্শ্বের ঘর হইতে চাকর এই সমস্ত শুনিয়া বুঝিল যে ইনি আমার প্রভুপত্নী।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে সকলে শুনিল যে গিলবার্ট একটি সামান্য কুলী রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি এখন আর সমস্ত দিন বিজ্ঞানাগারে আবদ্ধ থাকেন না, পার্কে পার্কে ঘুরিয়া বেড়ান। সকলে বলিল এখন দেখিতেছি গিলবার্টের জীবনটি বিচিত্র, প্রহেলিকাময়।

শ্রীভুপেন্দ্রলাল রায়

লাজুক।

ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু লাজুক। যে ঘরে এক ঘর লোক থাকৃত আমি সে ঘরে কিছুতেই যেতে পার্ত্তেম না। অচেনাদের কাছ থেকে পালিয়ে আমি ঘরের কোনে গিয়ে লুকুতেম। যদি কখনও বাধ্য হয়ে কোন অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা ক'রতে হ'তো, তাহলে আমি কেমন এক রকম জড় সড় ভাবে তার সাম্‌নে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকৃতেম। আমায় কেউ কিছু সামান্য প্রশ্ন ক'রলেই আমার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠ্‌তো! আমি কোন জবাব দেবার আগে খানিকটা মাথা চুলকুতেম, হাতের কব্জিতে রুমাল জড়াতেম, মেঝের উপর ঘস্‌তেম। বড় হয়েও আমার এ দোষ গেল না। আত্মীয় পরিজনের কাছে 'লাজুক' বলে আমার একটা কলঙ্ক রটে গেল! আমার সমবয়সীদের চখের সামনে দেখতুম কেমন হেঁসে খেলে সকলের সঙ্গে মিশছে আমোদ কর্চ্ছে, আমি কিন্তু তা কিছুতেই পেরে উঠ্‌তেম না! এই জন্যে আমার নিজের জীবনটা যেন কিছু নয় বলে মনে হত!

আমার বাপ মা বেঁচে নেই। আমার এক জ্যাঠ্‌তুতো ভাইয়ের হঠাৎ মৃত্যু হ'তে তাঁর অতুল বিষয় সম্পত্তির আমিই একমাত্র মালিক হয়েছি। আমার বয়স এখন চব্বিশ! আমার আত্মীয় বন্ধুরা আমাকে একটি বিবাহ ক'রে সংসারী হবার জন্যে উপদেশ দিচ্ছেন। তাঁরা আমার কাছে যে সব বিবাহযোগ্য মেয়ের উল্লেখ ক'রেছেন তার মধ্যে একজনকে আমার খুব পছন্দ হয়। সে আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকে, অনেকবার তাকে দেখেছি। দিব্যি ছোট খাট ফুট্‌ফুটে মেয়েটি। তার মুখখানির গড়নটি চমৎকার! দেখলেই বেশ শান্ত, শিষ্ট, লক্ষ্মীমেয়ে বলে চিন্‌তে পারা যায়। চোখ দুটী বড় বড়

পরিষ্কার নীল রঙের, গায়ের বর্ণ ধব্ ধবে ফর্সা। এক দিন সুবিধে পেলেই তার কাছে আমাদের বিয়ের কথাটা পাড়্বো ঠিক করে রাখ্লেম। ইতিমধ্যে তাদেরই বাড়ী আমার একদিন নিমন্ত্রণ হ'ল; আমি খুব আগ্রহের সহিত এই নিমন্ত্রণটা গ্রহণ ক'রলেম! যদিও এপর্য্যন্ত আমি কখনও কোনও সামাজিক ব্যাপারে মিশিনি, নিমন্ত্রণের চিঠি এলে আমার গায়ে জ্বর আস্তো তবু এ নিমন্ত্রণটা আমি নিশ্চয়ই রাখ্বো স্থির ক'রলেম কারণ এই বাড়ীতেই যে আমার মনের মত স্ত্রী আছে! তাদের বাড়ী কি না গেলে চলে?

কিন্তু এই নিমন্ত্রণটা রাখ্তে যাবার কথা আমি যখনই ভাব্তেম আমার বুকের ভেতরটা কেমন গুর গুর করে উঠ্তো। কেমন যেন একটা সভয় লজ্জা আমার সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরতো। কিন্তু আমার ভাবি পত্নীর খাতিরে সে লজ্জা সে ভয় আমি প্রাণপণে মন থেকে ঝেড়ে ফেল্তুম আর বুকে সাহস আন্বার চেষ্টা করতেন। সাহস করে না যেতে পার্লে যে বিয়ে করা হবে না!

অবশেষে যে দিনটীর জন্যে এত উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেম, সেদিন এসে উপস্থিত হ'ল। সন্ধ্যের পর পরিপাটি সাজগোজ করে আমার সেই আপেল রংএর মুক্তোর বোতাম দেওয়া রবিবারের চক্-চকে পোষাকটী পরে সাদা ওয়েষ্ট কোট্টি ভেতরে গায়ে দিয়ে, বাদামী মোজা জোড়াটী পায়ে দিয়ে বেশ হাসিমুখে বাড়ী থেকে বেরুলেম! রাস্তায় বড় একটা কেউ নেই দেখে প্রাণে ভারি স্ফুর্ত্তি হ'ল। হন্ হন্ ক'রে নিমন্ত্রণ বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলেম। কিন্তু যেই দূর থেকে তাদের বাড়ীটা আমার নজরে পড়্ল আর অমনি আমার সব সাহস কর্পূরের মত উবে গেল! যত স্ফুর্ত্তি সব তখন দারুণ দুর্ভাবনায় পরি-ণত হ'ল! আমার তখন কেবলই মনে হ'তে লাগল, হয়ত, তাদের বাড়ীর সব ঘরেই আজ অনেক লোক জড় হয়েছে, হয়ত কত অচেনা

লোকের সঙ্গে আলাপ ক'রতে হবে! তাই ত! কি বিপদ! নিমন্ত্রণটা না নিলেই ভাল হত! কি করি? এখন ত আর ফেরবার উপায় নেই—তাদের বাড়ীর সাম্‌নে এসে পড়েছি যে! যাক্—যা থাকে অদৃষ্টে! বলে আমি তাদের বাড়ীতে ঠেলে উঠ্‌লেম। দরজায় ঘণ্টা ঝুল্‌ছে—আর কেউ নেই। আমি যতবার ঘণ্টাটা বাজা'ব বলে হাত বাড়ালেম ততবারই আমার হাত কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল; কেমন একটা বিদ্‌কুটে লজ্জা এসে প্রত্যেক বারই আমায় বাধা দিতে সুরু কর্‌লে এমন সময় হঠাৎ কাঁচের দরজাটা খুলে একজন বেহারা বেরিয়ে এল আমিত' দোর খোলার আওয়াজ হতেই ঠিক চোরের মত চম্‌কে উঠেছিলেম তারপর বেয়ারাটাকে দেখে এমন থতমত খেয়ে গেলুম, যে আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না! বেয়ারাটা আমায় দেখে হেঁসে ফেল্‌লে, বোধ হয় আমায় চিন্‌তো; কিন্তু তার ঐরকম হাসি দেখে লজ্জায় তখনই আমার গাল দুটো, কান টান গুলো সব রাঙা হয়ে উঠ্‌লো।

তারপর বেহারা আমাকে দস্তুরমত অভিবাদন করে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি বাড়ীর কর্ত্তা একা বসে চিঠি লিখ্‌ছেন তাঁকে একা দেখে আমি হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচলুম। আঃ! তবু ভাল যে এখন কোনও অচেনা লোক এখানে আসেনি! কর্ত্তা আমাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে আমাকে অভ্যর্থনা কর্‌লেন এবং চিঠি কখানা শেষ করে ফেল্‌বার জন্য আমায় অনুমতি চাইলেন, কারণ সেগুলি জরুরী চিঠি সেদিন রাত্রের ডাকেই যাওয়া চাই। আমি কি উত্তর দেবো ভেবে ঠিক কর্‌তে পারলেম না। আমার ভদ্রতা আর বিনয় প্রকাশ কর্ব্বার জন্য মনে মনে আমি যথেষ্ট উৎসুক হলেও লজ্জায় আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না, কেবল একটু হেঁসে ঘাড়টি খুব নিচু করে হেঁট হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বৈঠকখানা থেকে তখন অনেকের

হাঁসি আর গানের শব্দ পিয়ানোর সুরের সঙ্গে মিশে আমার কাণে এসে লাগ্‌ছিল আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করছিল, আমার ভাবনা হচ্ছিল কি করে অত অপরিচিত লোকের সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'র্ব্ব? আমার যে এখন লজ্জা কর্‌ছে। আমিতো ওঘরে কিছুতেই ঢুক্‌তে পার্ব্ব না।

ইতিমধ্যে আমার নিমন্ত্রণ কর্ত্তার চিঠিগুলা লেখা শেষ হয়ে গেল, তিনি চিঠিকখানা ছাপবার জন্য বালির পুঁটুলিটা খুঁজছেন দেখে আমি তাঁকে সাহায্য কর্‌বার জন্যে তাড়াতাড়িতে বালির পুঁটুলি মনে করে কালির দোয়াতটা সেই চিঠিকখানার ওপর উপুড় করে ফেল্‌লেম। ছি ছি! ছি ছি! কি ঘেন্না! চিঠি কখানা তো নষ্ট হ'লই তার ওপর দামী বনাত মোড়া মেহগনী কাঠের ভাল টেবিলটার ওপর কালির ছড়াছড়ি! আমি তো-একেবারে অপ্রস্তুতের একশেষ! নিজের এই কীর্ত্তি দেখে নিজেই লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে হ'ল। একটু ভেবে এই অসভ্যতার প্রতিকার জন্যে তাড়াতাড়ি আমি পকেট থেকে আমার ধোপদস্ত রুমালখানা বের করে কালিটা পুছতে আরম্ভ কর্‌লেম বাড়ীর কর্ত্তা তখন হাঁসতে হাঁসতে আমায় সরিয়ে দিয়ে, একখানা ছেঁড়া নেকড়া নিয়ে টেবিলটা সাফ করে ফেললেন; তারপর আমাকে সঙ্গে করে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে ঢুকে আমি মহা বিপদে পড়্‌লেম। কিযে কর্ব্ব কিছুই ঠিক করতে পারলেম না। নিমন্ত্রণ কর্ত্তার পত্নী ও কন্যা (আমার ভাবী স্ত্রী) এসে আমাকে মহা সমাদরে ঘরের মাঝখানে নিয়ে গেলেন ও দুচারজন তাঁদের আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে একটিবার চোখাচোখি করেই মাথা নীচু করেছিলেম। সেক্‌হ্যাণ্ড কর্‌বার সময় কিছুতেই আর কারুর মুখের দিকে চাইতে পার্‌লেম না শুধু হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেম আমার বাদামি রংএর সিল্কের

মোজার ওপর যে প্রকাণ্ড কালির দাগটা লেগেছ সেটা যেন কেউ না দেখ্‌তে পায়।

খানিক পরে সকলের খাবার ঘরে ডাক পড়'ল। আমি এক বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে আবার এক বিপদে পড়তে চললেম। অবশ্য সকলেই আমার আগে খাবার ঘরে চলে গেল; আমি যাব কি যাবনা ভাব্‌তে ভাব্‌তে পা পা করে এগচ্ছিলেম। কোথাও যাওয়া আসা অভ্যাস না থাক্‌লে যে কি ভয়ানক অসুবিধায় পড়তে হয় আর কি বিষম যে লজ্জা করে তা সেদিন আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেম। দূর থেকে দেখলেম খাবার ঘরের ভিতর লোক একেবারে গিস্‌গিস্ করছে মেয়ে পুরুষের সমান ভিড়! তার ভেতর আবার বেশীর ভাগই আমার অচেনা; আমার তো ঘরের ভেতর যেতে ভারি লজ্জা বোধ হচ্ছিল—কিন্তু কি ক'রবো উপায় নেই কাজেই চোখ কান বুজে দু'ধার মাথা নুইয়ে অভিবাদন কর্‌তে কর্‌তে ঘরের ভিতর ঢুকছিলেম, আশা ছিল যে আমার এই রকম শিষ্টাচার দেখে সকলেই আমাকে বেশ ভদ্র ও বিনয়ী মনে কর্ব্বে কিন্তু আমার কপাল দোষে ঠিক তার উল্টো হয়ে গেল! আমি যখন ঐ রকম ঘন ঘন মাথা নাড়তে নাড়তে ঘরের ভেতর ঢুকচি একজন স্ত্রীলোক তখন চাট্‌নীর বোতল হাতে করে বেরিয়ে আসছিলেন আমি তাঁকে দেখ্‌তে না পেয়ে একেবারে তাঁর ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়্‌লেম। স্ত্রীলোকটী ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন তাঁর হাত থেকে চাট্‌নীর বোতলটা মেঝেয় পড়ে ভেঙ্গে গেল; সমস্ত চাট্‌নীটা মার্ব্বেল পাথরের ওপর ছড়াছড়ি! বুঝুন তখন আমার অবস্থাটা! আমি তো একেবারে মরমে মরে গেলেম! ছি ছি ছি! আবার অপ্রস্তুতের একশেষ! তারপর সেই স্ত্রীলোকটীকে যেমন তাড়াতাড়ি ধরে তুল্‌তে যাব অমনি সেই চাট্‌নীর ওপর না, পা হড়্‌কে দড়াম্ করে এক আছাড় খেলুম! সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট অট্ট

হাসিতে ঘরটা ভরে গেল! আমার ইচ্ছে হ'ল তখনি যেন সেইখানে মরি। তারপর পিছন ফিরে চেয়ে দেখি কি সর্ব্বনাশ! আমি একা পড়িনি পড়বার সময় আমার পায়ে আটকে আরও দুখানা চেয়ার উল্টে গিয়ে আরও দু'জন আছাড় খেয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন আবার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক। তাঁর মুখ দেখেই আমি একেবারে লজ্জায় কালিবর্ণ হয়ে গেলুম! এহে হে! এযে অপর কেউ নয় আমারই ভাবি পত্নী। আমার বুকটা একেবারে দমে যাবার মত হ'ল। তাইত, কি করি! এরকম অন্যায় পড়ার তো একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চাই, কাজেই চীৎকার করে বল্‌লেম" এ নিশ্চয়ই ভূমিকম্প। নইলে আমরা এত লোক একসঙ্গে পড়ে গেলেম কেন! ঘরের ভেতর আবার একটা অট্টহাসির রোল উঠ্‌ল! আমার নিমন্ত্রণ কর্ত্তা আমার এত বড় একটা মস্ত কেলেঙ্কারী হেঁসে উড়িয়ে দিলেন যেন কিছুই হয়নি! আমি মনে মনে তাকে সহস্র ধন্যবাদ দিলেম, তাঁর এ দয়ার কথা আমি জীবনে কখনও ভুলবো না। তিনি আমায় হাত ধরে নিয়ে গিয়ে খেতে বসিয়ে দিলেম। আমি ঘাড় হেঁট করে খাবারের ডিসের দিকে চেয়ে রইলেম। লজ্জায় ঘেন্নায় আমার বুক ফেটে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল; কোন দিকে আর চাইতে সাহস হচ্ছিল না পাছে কারও বিদ্রূপপূর্ণ চোখে চোখ পড়ে।

আমার ভাবি পত্নী কিন্তু আমার অপরাধ গ্রহণ করেনি। সে খাবার সময় আমার পাশে এসে বসেছিল। রাঁধুনী গরম মাংসের ঝোল পরিবেশন করে গেল। আমার এই মনের মতন ক'নেটীর নাম কি জান? শ্রীমতী বার্ব্বেটী!—বার্ব্বেটী আমাকে এক ডিস ঝোল খাবার জন্য এগিয়ে দিলে; আমি ডিশটী তুলে খেতে গিয়ে দেখি, বার্ব্বেটীর ঝোলের ডিশ নেই, সুতরাং আমার আর ঝোল খাওয়া হ'ল না, কি করে হবে? বার্ব্বেটী না খেলে কি আমি খেতে পারি। তাই

আমি ঝোলটা তাকেই খেতে বল্লেম। সে কিছুতেই খাবে না আমিও ছাড়ব না, কেবলই তাকে অনুরোধ করতে লাগলুম এদিকে ডিশটা যে ক্রমশঃই আমি বেঁকিয়ে ধরেছিলেম সেদিকে আর মোটেই হুঁস ছিল না, শেষ যখন হুড় হুড় করে অনেকটা গরম ঝোল গড়িয়ে টেবিলের ওপর ছুড়িয়ে পড়ল তখন আমার খেয়াল হ'ল ! এঃ, ছ্যা ছ্যা ছ্যা আবার একটা কেলেঙ্কারী ক'রলুম ! সেই ঘি দেওয়া মশলা দেওয়া গরম মাংসের ঝোল যখন টেবিলের ওপর থেকে গড়িয়ে আমার নতুন পায়জামার ওপর বার্ব্বেটীর দামী ঘাগ্‌রার ওপর এবং ওপাশের আরও দু'চারজন ভদ্রলোকের ভাল ভাল পোষাকের ওপর গিয়ে পড়্‌তে লাগল, আর তারা যখন এক একটা চিৎকার করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে লাগ্‌ল, সে দৃশ্য আমি আমার জীবনের শেষ দিনেও ভুলবো না।

বার্ব্বেটী পোষাক বদ্‌লাবার জন্য উঠে যেতে বাধ্য হ'ল। আমি তখন সেই ক্ষতিগ্রস্ত ভদ্রলোকদের কাছে আমার এই অন্যায়ের জন্য একরকম জড়ান অস্পষ্ট ধরা গলায় বিড়্ বিড়্ করে মাপ চাইতে লাগ্‌লেম ; আমার পায়জামা থেকে ধোপার বাড়ীর ইস্ত্রীরীর মত তখনও গরম ঝোলের ধোঁয়া উড়্‌ছে।

আমার আর এক ডিস ঝোল তখনই আনিয়ে দেওয়া হ'ল। আমি আর কোন কথাটী না কয়ে তাড়াতাড়ি হাতপোঁছা তোয়ালে খানা ওয়েষ্ট কোটের পকেটে গুঁজে ফেলে খুব হেঁট হয়ে ঝোল খেতে সুরু করে দিলুম। (তখন অতটা লক্ষ্য করিনি যে তোয়ালের খুঁটের সঙ্গে আমি টেবিল ক্লথের খানিকটাও ওয়েষ্ট কোটের পকেটে পুরিছি। সেটা পরে জানা গেল।) একটু পরেই বার্ব্বেটী ফিরে এল। আমি তার কাছে অনেক মিনতি করে আমার অসাবধানতার জন্য মাপ চাই-লেম। বার্ব্বেটী শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাঁস্‌লে ; কি

মিষ্টি হাঁসি! হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে আমায় বুঝিয়ে দিলে যে ওতে আমার কোনও দোষ হয়নি। তারই দোষে ওটা হয়েছে ; দৈবাৎ ওরকম সকলেরই হয়ে থাকে। আহা, কথাগুলি শুনে প্রাণে স্বোয়াস্তি পেলুম। চুপি চুপি সকলের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলেম তারা বেশ প্রফুল্ল হয়ে আছে ; বুঝলুম আমার অপরাধ তেমন গুরুতরভাবে কেউ নেয়নি—আমার বুক থেকে যেন একখানা বিশ মণ পাথর নেমে গেল। একটু বেশ আরাম বোধ করতে লাগলেম তখন পকেট থেকে রুমাল-খানা বার করে নাকের ডগাটায় আর কপালে যে বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়েছিল বেশ রগ্‌ড়ে মুছে ফেল্‌লেম। হায়! এই ঘাম মোছাই আবার আমার কাল্ হ'ল। সবে মাত্র বাড়ীতে ঢুকেই এই অপয়া রুমালখানা দিয়ে যে পড়বার ঘরের প্রথম কেলেঙ্কারীটা সারতে গিয়ে-ছিলেম সেটা একেবারেই মনে ছিল না সুতরাং মুখটা পুঁছে রুমাল-খানি নামাতেই ঘরের ভেতর একেবারে হাসির হর্‌রা উঠে গেল। আমি প্রথমে হাসির কারণটা ঠিক বুঝতে পারিনি কিন্তু যখন দেখলেম সবাই একদৃষ্টে আমারই মুখের দিকে চেয়ে আছে, কেউ কেউ আঙ্গুলও দেখাচ্ছে তখন আমার হঠাৎ খেয়াল হল যে হয়ত আমিই ওদের হাঁসির কারণ ; আবার কি করেছি ভেবে লজ্জায় ঘাড় হেঁট করতেই হাতের কালি মাখা রুমালখানা নজরে পড়ল। তখনই বজ্রাঘাতের মত বুঝতে পারলেম কেন আমার মুখখানা এত হাঁসির ঢেউ তুলেছে। আমি আর এক মিনিটও সেখানে না বসে সাবান দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেল্‌বার জন্য কলঘরের দিকে ছুটলেম। যেমন ছোটা অমনি সঙ্গে সঙ্গে টেবিল ক্লথখানাও উঠে আসা! (কারণ একটু আগে তার একটা কোণ আমি না দেখে বেশ এঁটে তোয়ালের সঙ্গে ওয়েষ্ট কোটের পকেটে গুঁজে ছিলেম) টেবিল ক্লথের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের ডিস বাটী, গেলাস, পেয়ালা, ছুরি, কাঁটা, চাম্‌চে, নুনের জার, রাইয়ের শিশি সব ঝন্ ঝন্

করে ছিট্‌কে পড়ে চুরমার হতে লাগল। নিমন্ত্রিত লোকেরা সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে তাদের মুখের খাবারের এই দুর্দ্দশা দেখ্‌ছিলেন এমন সময় বাড়ীর কর্ত্তা ছুটে এসে টেবিল ক্লথখানা চেপে ধরতেই আমার পকেট থেকে সেটা খুলে গেল। যেমন খুলে যাওয়া আমিও অমনি পেছন ফিরে ছুট্‌। বন্‌ বন্‌ করে ছুটে বেরিয়ে এসে সটান আমার নিজের বাড়ীতে ঢুকে একেবারে সোবার ঘরে ঢুকে খিল্‌। ছি ছি ছি! কি লজ্জা! কি ঘেন্না! কেমন করে আর আমি তাদের মুখ দেখাব?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দেব।

"আঘাত"

কি সুখে রাখিব আর এ ছার জীবন ভার।
আর বীণা বাজিবে না ছিঁড়ে গেছে হৃদি তার॥
গেছে সুখ, গেছে আশা, না মিলিল ভালবাসা।
অতৃপ্ত এ প্রেম তৃষা বেঁচে থাকা যাতনার॥
আয়রে মরন আয়, জুড়াব তোমার ছায়,
কি আর বলিব হায় প্রাণ হন্ত্রী সে আমার।
সখা! কেহ কাঁদিও না, কারে ভাল বাসিও না;
আর মনে রাখিও না, জীবনী এ অভাগার॥

৺রাজেন্দ্রনাথ নন্দী।

---

* সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ লেখক Heinrich Zchokke'র "Max Stolprian নামক গল্পের অনুবাদ।

কর্ম্মবীর বটকৃষ্ণ

বিশ্ববিখ্যাত ঔষধ ব্যবসায়ী স্বনামখ্যাত বটকৃষ্ণ পাল মহাশয় গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতঃকালে ৺কাশীধামে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। বটকৃষ্ণের পরিচয় বাঙ্গালীর কাহাকেও বিশেষভাবে দিতে হইবে না। রাজাধিরাজ হইতে সামান্য ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেই বটকৃষ্ণের নাম জানেন কর্ম্মবীর কর্ম্মভার যোগ্য পুত্র ভূতনাথের উপর অর্পণ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল ১৮৩৩ খৃঃ কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী শিবপুর সহরে প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পালবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বটকৃষ্ণদের আর্থিক অবস্থা তখন ভাল ছিল না। তাহার উপর শৈশবে দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে পিতৃমাতৃহীন হন। অর্থ ও অভিভাবকহীন হইয়া বটকৃষ্ণ ৮২নং বেণেটোলা ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে বটকৃষ্ণের কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয়।

তিনি নূতন বাজারে তাঁহার মাতুলের মশলার দোকানে কার্য্যারম্ভ করেন; কিছুদিন পরে মশলার দোকানে সামান্যভাবে কার্য্য করা তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাটের কার্য্যে মনোনিয়োগ করিলেন। এ কার্য্যেও তাঁহার মনের তৃপ্তি হইল না। উক্ত কার্য্যার্থে বটকৃষ্ণ একদিন নৌকাযানে নদী পার হইতে গিয়া দৈবদুর্ব্বিপাকে জলমগ্ন হন। কিন্তু ভগবান এই ভাগ্যবানের দ্বারা অনেক কার্য্য করাইবেন বলিয়া রক্ষা করেন। অতঃপর ১৮ বৎসর বয়সে তিনি ১২ নম্বর খোঙরা পটীতে একটী ছোট মশলার দোকান খরিদ করিলেন।

অর্থাভাবে এ দোকানও উঠিয়া যাইবার উপক্রম হওয়ায় জোড়া-

স াঁকোর মাধবচন্দ্র দাঁর সহিত যৌথ কারবার করিলেন। মাধবচন্দ্র দাঁর দোকান হইতে জিনিষপত্র সরবরাহ করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন। চারি বৎসর পরে ২২ বৎসর বয়সে বটকৃষ্ণ এখন যে ব্যবসায়ে অদ্বিতীয় সেই ঔষধ ব্যবসায়ের সূচনা করেন। উক্ত দোকানে কিছু কিছু বিলাতী-বিদেশীয় ঔষধ বিক্রয় করিতে লাগিলেন। বটকৃষ্ণ অসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে এই ব্যবসায়ে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এখন বটকৃষ্ণের নাম ঔষধ ব্যবসায়ীদিগের নামের শীর্ষস্থানীয়।

খোঙ্গরাপটী ষ্ট্রীটস্থ ১২০।১২১ সংখ্যক বাটীর আদি দোকান ব্যতীত বটকৃষ্ণ পালের আরও চারিখানি ঔষধালয় আছে।

আজ বিশ বৎসর হইল, পাল মহাশয় তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভূতনাথ পালের উপর কার্য্যভার অর্পণ করিয়া সাংসারিক কর্ম্ম জীবন পরিত্যাগান্তে ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। এতাবৎকাল ৺কাশীবাস করিয়া বিগত ২৯ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতঃকালে গঙ্গাপ্রাপ্ত হন।

বটকৃষ্ণ কেবলমাত্র যে কর্ম্মবীর ছিলেন তাহা নহে। দান ধর্ম্মেও তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। দরিদ্রগণকে ঔষধ ও অর্থসাহায্যে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন, তিনি শিবপুরে নিজজন্ম স্থানে একটী হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নিজ বেণেটোলার বাটীতে দুইটী নিম্ন-প্রাইমারি স্কুল, একটী বালকদিগের ও অপরটি বালিকাদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। 'কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি,'—বটকৃষ্ণের মৃত্যু হয় নাই তিনি স্বোপার্জ্জিত যোগীজন-বাঞ্ছিত বিশ্রামলাভের নিমিত্ত অমরধামে যাইবার জন্ত আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইলেন! তাঁহার তিরোধানে, তাঁহার মায়াপাশ মুক্তিতে শোক করিতে নাই জানি। কিন্তু ভূতনাথ বাবু সাংসারিক হিসাবে পিতৃহীন হইলেন এজন্ত আমরা ক্ষুদ্র

সাংসারিক 'শোকপ্রকাশ করিতেছি' না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। অনেক দরিদ্র আত্মীয় স্বজন তাঁহার স্নেহে বঞ্চিত হইলেন এজন্ত তাঁহারা বিষন্ন। তাঁহাদিগের দুঃখে আমরা সহানুভূতি জ্ঞাপন করি ও আশা করি ভূতনাথ বাবুকে পাইয়া শীঘ্রই তাঁহাদিগের সে সকল দুঃখ অপনোদিত হইবে।

চক্রভেদ।

(পূর্ব্বসংখ্যার ৫৯ পৃষ্ঠার পর)

তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় কাশীনাথ যেন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, এইরূপ ভাব দেখাইয়া একখানি বেঞ্চে গিয়া বসিলেন। গাড়ী আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে, কাশীনাথ এতটা সময় নষ্ট করিবার লোক নহেন। তিনি মাথার পাগড়ীটা একটু টানিয়া মুখের অর্দ্ধেক ঢাকিয়া নিদ্রা যাইবার উদ্যোগ করিলেন। যেখানে সেখানে যেমন তেমন অবস্থায় নিদ্রা যাইতে তিনি বিলক্ষণ অভ্যস্ত ছিলেন। অথচ নিদ্রার জন্য তিনি কাজ নষ্ট করিতেন না; যতটুকু সময় তাঁহার হাতে থাকিত কেবল সেই সময়টুকু নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেন। অদ্যও ট্রেণ আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি গাত্রোত্থান করিলেন।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে চারিদিকে চাহিয়া কাশীনাথ দেখিলেন গৃহটী প্রায় জনশূন্য; কেবল একজন যাত্রী ট্রেণের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে প্রথম ঘণ্টা বাজিবামাত্র আগন্তুক পুণার টিকিট প্রার্থনা করিল। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই কাশীনাথ চমকিয়া উঠিলেন। একটু লক্ষ্য করিতেই চিনিলেন, আগন্তুক অপর কেহই

নহে, বলবন্ত রাও স্বয়ং। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এত রাত্রিতে রাও সাহেবের পুণায় গমনের কি বিশেষ প্রয়োজন পড়িল ?

কাশীনাথ পাগড়ীটি আরও একটু ভাল করিয়া মুখের উপর টানিয়া মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং কেবল চক্ষু দুইটী অল্প বাহির করিয়া রাও সাহেবের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

রাও সাহেবকে অত্যন্ত ব্যস্ত বলিয়াই বোধ হইল। তিনি মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখিতেছেন এবং ট্রেণের বিলম্বের জন্য অধীরতা প্রকাশ করিতেছেন। এক একবার ব্যস্তভাবে গৃহমধ্যে পদচালনা করিতেছেন, কখনও বা গোঁফে চাড়া দিতেছেন।

কাশীনাথ মনে মনে ভাবিলেন, "বালাজীর গরজ যে বড় বেশী দেখছি। আজ রাত্রিতে আর ঘুমাইবার অবসর ঘটিল না, তোমার উপর একটু নজর না রাখিলে চলিতেছে না।"

অবশেষে গাড়ী আসিল। রাও সাহেব গার্ডের হস্তে একটী টাকা দিলেন। গার্ডও তাঁহাকে একটী শূন্য কক্ষে তুলিয়া দিল। কাশীনাথ তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কামরায় প্রবেশ করিলেন।

ট্রেণ পুণায় উপস্থিত হইলে একটী যুবকের সহিত রাও সাহেবের সাক্ষাৎ হইল। যুবক রাও সাহেবের সমবয়স্ক এবং পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝা গেল তাঁহার সমুপদস্থও বটে। যুবক সাহেবকে সঙ্গে করিয়া একখানি ঠিকা গাড়ীতে উঠিল। কাশীনাথ বুঝিলেন, যুবক পূর্ব্বাহ্নে ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া রাও সাহেবের জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল। রাও সাহেব অথবা যুবক কাহাকেও গাড়োয়ানকে একটীও উপদেশ দিতে হইল না। তাঁহারা গাড়ীতে উঠিতেই গাড়োয়ান দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইল। কাশীনাথ একটু বিপদে পড়িলেন। এত রাত্রিতে ষ্টেশনে অপর কোন গাড়ী ছিল না, সুতরাং গাড়ী করিয়া তাহাদের অনুসরণ করা অসম্ভব। আর গাড়ী থাকিলে বিচক্ষণ

গোয়েন্দা দেখিলেন এত রাত্রিতে একখানি গাড়ী যদি অপর একখানি গাড়ীর অনুসরণ করে তাহা হইলে এই দৃশ্যের প্রতি সহজেই লোকের দৃষ্টি পড়িতে পারে।

আর পদব্রজে অনুসরণ করাও সহজ নহে। একজন লোক এক-খানি গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াইবে ইহাও এত রাত্রিতে অল্প কৌতুককর দৃশ্য নহে। কিন্তু নিরুপায় কাশীনাথ দৌড়ানই সঙ্গত মনে করিলেন।

ভাড়াটিয়া গাড়ীর ঘোড়া দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। ঘোড়ার সহিত মানুষের দৌড়াদৌড়ির পাল্লা অভিনব দৃশ্য। কিন্তু কাশীনাথ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি গাড়ীর সহিত সমবেগে দৌড়িতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে পথে কোন প্রহরী তাঁহার গতিরোধ করিল না, অথবা কোন বাধাও উপস্থিত হইল না।

দৌড়িতে দৌড়িতে গাড়ী একস্থানে থামিল। যুবকদ্বয় গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া দিল। গাড়ী দৃষ্টি পথের অতীত হইলে যুবকেরা কিয়দ্দূর পদব্রজে গমন করিয়া একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাঁহারা বাটীর সদর দ্বারে গমন না করিয়া বাটীর পার্শ্বে একটী গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ গলির মধ্যে বাটীর একটী দ্বার বাহিরের দিকে তালা বদ্ধ ছিল। আগন্তুক যুবক তাহার পকেট হইতে একটী চাবি বাহির করিয়া তালা খুলিয়া ফেলিলে উভয়ে সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

এ যাবৎ কাশীনাথ অলক্ষ্যভাবে যুবকদ্বয়ের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। যে বাটীতে তাহারা প্রবেশ করিল, তাহা কাশীনাথের অপরিচিত ছিল না। তিনি মহা-বিস্মিত হইলেন।

কাশীনাথ শুনিয়াছিলেন, ঐ বাটীতে পুণা নগরের একজন সম্ভ্রান্ত ধনবান্ ব্যক্তি বাস করিতেন। রাজপুরুষদিগের নিকট এই ভদ্রলোক-

টীর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। রাওসাহেবের চরিত্র-সম্বন্ধে কাশীনাথের মনে পূর্ব্বাবধি ঘোর সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। রাও সাহেবের সমভিব্যাহারী যুবককে যদিও তিনি এইমাত্র সর্ব্বপ্রথম দর্শন করিলেন, তথাপি স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিলে সেও যে চরিত্রবিষয়ে রাও সাহেবেরই সমতুল্য এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। সুতরাং এরূপ স্খলিত-চরিত্র যুবকদ্বয়ের এরূপ রহস্যজনক নিশাভ্রমণ এবং গোপনভাবে একজন দেশবিশ্রুত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাটীতে প্রবেশ বিস্ময়ের কথা নহে কি ?

কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা কাশীনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাঁহার অনুমান সত্য কি না তৎ-সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইবার জন্য তিনি একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন। কারণ কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না করিয়া কোন লোকের বা স্থানের পরিচয় লইবার জন্য এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত বাটী হইতে চারিখানি বাটীর পরে একখানি বাটীর সদর দরজায় গিয়া কাশীনাথ খুব জোরে ধাকা দিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ডাকাডাকির পর একজন ভৃত্য ভিতর হইতে বলিল, "কে রে, মাতাল কোথাকার, চলে যা এখান থেকে, গোলমাল করিস্ না।"

কাশীনাথ মহা বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়া বলিলেন, "আমি মাতাল নহি। আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

"কাহাকে খুঁজিতেছ।"

"ডাক্তার বিনায়ক জোশীকে !"

"তবে রে পাজী ! কোন্ বাড়ীতে তোর ডাক্তার থাকে, আগে তার সন্ধান না ক'রে রাত দুপুরে লোকের ঘুম ভাঙ্গাতে এসেছিস্।

"রাগ কর কেন ভাই। আমি মনে করেছিলাম এই বাড়ী। এ বাড়ীতে তিনি যদি না থাকেন তবে কোন্ বাড়ীতে তিনি থাকেন,সেটা

আমাকে না হয় বলেই দাও,আমি তোমাকে এক টাকা বকশিশ দিচ্ছি।"

বক্তা তখন বাহিরে আসিয়া টাকাটি হস্তগত করিল ; পরে অম্লানবদনে বলিল, "আমি বিনায়ক ডাক্তারের নামও কখনও শুনি নাই।"

কাশীনাথ ভীতভাবে বলিলেন, "কখনও নামও শুন নাই।"

"এইমাত্র তোমার মুখে শুনিলাম। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও শুনি নাই।" এই বলিয়া লোকটী দরজা বন্ধ করিতে উদ্যত হইল।

পূর্ব্বোক্ত যে বাটীতে যুবকেরা প্রবেশ করিয়াছিল, সেই বাটীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ বাটীতে কি তিনি থাকেন ?"

"না, ঐ বাড়ীতে মাননীয় গণপৎ রাও দেশমুখ বাস করেন।"

"তবে কি উহার পার্শ্বের বাটীতে তিনি বাস করেন ?"

"না, ও বাড়ীতেও বিনায়ক ডাক্তার বলিয়া কেহ বাস করেন না।"

"এখানে অপর কোন ডাক্তার থাকেন কি ?"

"হাঁ, আমাদের বাড়ী হইতে নয়খানি বাড়ী পরে একজন ডাক্তার বাস করেন। তিনি এখানে নূতন আসিয়াছেন।"

"তাঁহার নাম কি ?"

"নাম এখনও জানিতে পার নাই।"

তখন কাশীনাথ যুবকেরা যে বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল সেই বাটীর দিকে পুনরায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তবে ঐ বাড়ীতেও বিনায়ক ডাক্তার বলিয়া কেহ বাস করেন না ?"

"না, ঐ বাড়ীতে গণপৎ রাও বাস করেন।"

"ঠিক জান ?"

"হাঁ, আমি প্রত্যহই তাঁহাকে দেখিতে পাই।" এই বলিয়া লোকটী দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন, সম্পাদিত।

হেঁয়ালি।

৫। চারি অক্ষরে নাম তার জগৎ পূজিত।
প্রথম দুই অক্ষরে হয় চোরের উচিত॥
শেষ দুই অক্ষর যদি আমি পাই।
পুত্র পৌত্র আদি সুখে ব'সে খাই॥

৬। বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দ্বার।
যোগেন্দ্র পুরুষ তাহে থাকে নিরাহার॥
যখন পুরুষ বর হয় বলবান।
বিধিকৃত ঘর ভেঙ্গে করে খান খান॥

(চতুর্থ সংখ্যায় উত্তর থাকিবে।)

শ্রীমতী উষাবালা—

দ্বিতীয় সংখ্যার হেঁয়ালির উত্তর।

(৩) জামাই। (৪) ভাগিনা।

নিরিখ।

পাঁচ ইয়ার—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী পাঁচ ইয়ারের অন্যতম 'নয়ন-তারা' ওরফে "কবি কালিদাস" প্রণীত। পুস্তকখানি অপরূপ নূতন ভাবে রচিত। আমরা এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক পুস্তক ইহার পূর্ব্বে পাঠ করি নাই। মুনীন্দ্র না হইলে "কথায় কথায় কবিতা শুনাইবে কে? নানা দেশের নানা কথা, নানা আচার পদ্ধতির কথা বলিবে কে? গগনভেদী উচ্চ তানে সুমিষ্ট সঙ্গীত শুনাইবে কে? মুনীন্দ্রপ্রসাদ যে আমাদের নয়ন-তারা" জিতারহো শ্রীযুত মুনীন্দ্র! বাহবা নয়ন-তারা! 'দেখন হাসি হ'লে রাজ চটক!

অমূল্যচরণ।

কলিকাতা—১৯নং ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান, "বিষ্ণু-প্রেস" হইতে
শ্রীবিষ্ণু পদ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।